KATHA SAHITYA
AND
PRABANDHA SAHITYA

BA [Bengali]

Second Semester

[BENGALI EDITION]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Smt. Chinmoyee Banerjee (Retired)
Calcutta University

Author: Prof Anirban Bhattacharya, Professor of Bengali, Mahadevananda Mahavidyalaya

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই ম্যাপিং
প্রথম একক ঃ চন্দ্রশেখর, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস প্রসঙ্গ ও চন্দ্রশেখর উপন্যাস, উপক্রমনিকা অংশ - চন্দ্রশেখর উপন্যাস, শৈবলিনী বঙ্কিম উপন্যাসের এক দুঃসাহসী নারী চরিত্র তার পরিণাম ও শিল্পমূল্য, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের নির্ধারণ, প্রতাপ চরিত্র, মীরকাসিম চরিত্র, দলনী, রমানন্দ স্বামী, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র , 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত উপাদান।	**একক - ১** **(পৃষ্ঠা ১-২৭)**
দ্বিতীয় একক ঃ পদ্মা নদীর মাঝি-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও শিল্পীমানস, পদ্মানদী-চারিত্রিক উত্তরণ, আঞ্চলিকতার অনুষঙ্গে 'পদ্মানদীর মাঝি', কুবের চরিত্র-জন্মগত ও পরগত, মালা চরিত্রের পূর্ণতা, অপূর্ণতা, কপিলা-নারীজীবনের বিপরীত স্রোতের পথিক, হোসেন মিয়া-'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের বহুমাত্রিক চরিত্র, উপন্যাসের সঙ্গীত ও ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়, পদ্মানদীর মাঝি-কাহিনীর নির্মাণ, পদ্মানদীর মাঝি-ভাষা পরিচয়।	**একক - ২** **(পৃষ্ঠা ২৯-৫৮)**
তৃতীয় একক ঃ অতিথি, ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতিথি গল্পের পটভূমিকা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও নাম করণের ব্যঞ্জনা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২খ্রীঃ- ১৯৮২ খ্রীঃ), চোর-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯খ্রীঃ- ১৯৯৫খ্রীঃ), ছিন্নমস্তা আশাপূর্ণা দেবী।	**একক - ৩** **(পৃষ্ঠা ৫৯-৮২)**
চতুর্থ একক ঃ শিক্ষার হেরফের, শিক্ষার হেরফের ঃ রবীন্দ্র-বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতবর্ষের ইতিহাস, শকুন্তলা, মনুষ্য, সাহিত্য-শিল্প ও সাধারণজীবন ঃ রবীন্দ্র-অভিমত।	**একক - ৪** **(পৃষ্ঠা ৮৩-১০১)**

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম একক ঃ (পৃষ্ঠা ১-২৭)

- চন্দ্রশেখর
- ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ইতিহাস প্রসঙ্গ ও চন্দ্রশেখর উপন্যাস
- উপক্রমনিকা অংশ - চন্দ্রশেখর উপন্যাস
- শৈবলিনী বঙ্কিম উপন্যাসের এক দুঃসাহসী নারী চরিত্র তার পরিণাম ও শিল্পমূল্য
- 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের নির্ধারণ
- প্রতাপ চরিত্র
- মীরকাসিম চরিত্র
- দলনী
- রমানন্দ স্বামী
- 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র
- 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত উপাদান

দ্বিতীয় একক ঃ (পৃষ্ঠা ২৯-৫৮)

- পদ্মা নদীর মাঝি-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও শিল্পীমানস
- পদ্মানদী-চারিত্রিক উত্তরণ
- আঞ্চলিকতার অনুষঙ্গে 'পদ্মানদীর মাঝি'
- কুবের চরিত্র-জন্মগত ও পরগত
- মালা চরিত্রের পূর্ণতা, অপূর্ণতা
- কপিলা-নারীজীবনের বিপরীত স্রোতের পথিক
- হোসেন মিয়া-'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের বহুমাত্রিক চরিত্র
- উপন্যাসের সঙ্গীত ও ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়

টিপ্পনী

- পদ্মানদীর মাঝি-কাহিনীর নির্মাণ
- পদ্মানদীর মাঝি-ভাষা পরিচয়

তৃতীয় একক ঃ **(পৃষ্ঠা ৫৯-৮২)**

- অতিথি
- ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- অতিথি গল্পের পটভূমিকা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও নাম করণের ব্যঞ্জনা
- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)
- জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২খ্রীঃ- ১৯৮২ খ্রীঃ)
- চোর-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
- আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯খ্রীঃ- ১৯৯৫খ্রীঃ)
- ছিন্নমস্তা আশাপূর্ণা দেবী

চতুর্থ একক ঃ **(পৃষ্ঠা ৮৩-১০১)**

- শিক্ষার হেরফের
- শিক্ষার হেরফের ঃ রবীন্দ্র-বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী
- ভারতবর্ষের ইতিহাস
- শকুন্তলা
- মনুষ্য
- সাহিত্য-শিল্প ও সাধারণজীবন ঃ রবীন্দ্র-অভিমত

ভূমিকা

টিপ্পনী

প্রস্তাবনা

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ধারিত পাঠক্রম অনুসারে স্নাতকশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিতীয়পত্রঃ কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্য গ্রন্থখানি প্রণীত হল। গ্রন্থে প্রত্যেকটি একক-এর জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, মূল বিষয়বস্তুবোধে এই আলোচনা শিক্ষার্থীদের একান্ত সহায়ক হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কেবল নির্দিষ্ট বিষয়পাঠ নয়, বিষয়পাঠের সঙ্গে সঙ্গে লেখক-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যদর্শ সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক - এ কথা বিবেচনা করেই এই গ্রন্থে প্রত্যেক ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার এবং প্রাবন্ধিকের সাহিত্যজীবনের নাতিদীর্ঘ পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

এছাড়া পাঠ-প্রস্তুতির জন্য প্রত্যেকটি এককের শেষে সংযুক্ত হয়েছে পর্যাপ্ত সংখ্যায় রচনাধর্মী ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন। গ্রন্থখানি যদি শেষপর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনোপযোগী হয়ে ওঠে, তবে গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক বলে প্রতিপন্ন হবে।

প্রথম একক

চন্দ্রশেখর

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

টিপ্পনী

যথার্থ বাংলা উপন্যাসের প্রথম সষ্টা হলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়া তাঁর পূর্বে যাদের পচনায় উপন্যাস শিলোর সামান্যতম আভাস পাওয়া গিয়েছিল তাঁরা হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩) নববাবুবিলাস ১৮২৫ নববিবিবিলাস ১৮৩১ টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র আলালের ঘরে দুলাল১৮৫৪ কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাঁচার নক্শা ১৮৬১ হ্যানা ক্যাথারিন ম্যুলেস ফুলমণি ও করুনার বিবরণ ১৮৫২ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় অন্তরীয় বিনিময় সফল স্বপ্ন। কিন্তু কাহিনী চরিত্র সংলাপ বাস্তব প্রতিবেশ রচনা ঔপন্যাসিকের সুচিন্তিত জীবন দর্শন , মানবজীবন সত্যের অনুসন্ধান চরিত্রের বিকাশধর্মী গতি প্রকৃতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য শৈল্পিক সৌন্দর্য মন্ডিত হয়ে প্রাক বঙ্কিমযুগের গদ্য লেখদের রচনায় প্রতিফলিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পথম উপন্যাসের প্রকাশ কাল ১৮৬৫ খ্রীঃ। এবং শেষ উপন্যাসের প্রকাশ কাল ১৮৮৭খ্রীঃ এই বাইশ বছর সময় কালে বঙ্কিমচন্দ্ররচিত উপন্যাসগুলি হল দুর্গেশনন্দিনী১৮৬৫ কপালকুন্ডলা ১৮৬৬ মৃগালিনী ১৮৬৯ বিষবৃক্ষ ১৮৭৩ ইন্দিরা ১৮৭৩ যুগলান্তরীয় ১৮৭৪ চন্দ্রশেখর ১৮৭৫ রজনী ১৮৭৭ কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮ রাজসিংহ ১৮৮২ আনন্দমঠ ১৮৮৪ দেবীচৈধুরাণী ১৮৮৪ রাধারাণী ১৮৮৬ এবং সীতারাম ১৮৮৭। সংখ্যার বিচারের বঙ্কিমচন্দ্রে রচনার সংখ্যা চোদ্দ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস লিখিত হয়েছিল ইংরেজী ভাষায় । উপন্যাসটির নাম rajmohas wife - ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত এটি একটি অসমাপ্ত রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মতো। বিষয় বস্তুগত দিক থেকে তাঁর উপন্যাসগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন -

১. ইতিহাসাশ্রয়ী রোমন্সধর্মী উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী কপালকুন্ডালা মৃনালিনী উন্দিরা যুগলাসুরীয় চন্দ্রশেখর সীতারাম।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস - রাজসিংহ।

৩. উতিহাসের আধারে রচিত তত্ত্বমূলক উপন্যাস আনন্দমঠ দেবী চৌধুরাণী। আনন্দমঠকে আবার জতীয় ভাবমূলক এবং রাজনৈতিক উপন্যাস আখ্যাও দেওয়া হয়।

৪. সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস বিষবৃক্ষ রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উন্দিরা রাধারাণী সঠিক অর্থে উপন্যাস কিনা এনিয়ে সমালোচকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। আমরা রচনা দুটিকে উপন্যাসোপম বলে উল্লেখ করতে পারি।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেকে একটি বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান তুলনারহিত। কেউ কেউ তাঁকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে থাকেন।

প্রেমই বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। মানবজীবন ও সভ্যতার ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে মানুষের নানা বিধ মানসিক বৃত্তির মধ্যে প্রেমকে অন্যতম আদিম বৃত্তি বলে মেনে নেওয়া হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচনে সেজন্য প্রেমের বিচিত্র গতিকেই পরিস্ফুটিত করতে চেয়েছেন। সেজন্যই তাঁর উপন্যাসের প্রদের্শনীশালায় এত বিচিত্র নর নারীর গৌরবময় সমাগম।

টিপ্পনী

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে চন্দ্রশেখর অন্যতম। বাংলা বিহার উড়িয়্যার নবাব মীরকাসেমের সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র এউপন্যাসে চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনীর এক ত্রিভূজ জীবন সমস্যার নাটকীয় কাহিনী বয়ন করেছেন।

ইতিহাস প্রসঙ্গ ও চন্দ্রশেখর উপন্যাস

ইতিহাসের আধারে রোমান্স জাতীয় উপন্যাস রচনা করা বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীস্বভাবের এক প্রিয়তম বিষয়। অনেকে বলেন ইংল্যান্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের আদর্শে প্রভাবিত হয়েই তিনি এ জাতীয় উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। এই বক্তব্য খুব একটা অযৌক্তকও নয়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন মধ্যযুগ বা প্রাক্ আধুনিক যুগের অনুষঙ্গ বজায় রাখার জন্যই ইতিহাসের প্রবল ঘটনাবেগ হৃদয় ও প্রবৃত্তির আবেগ এবং পটভূমির ঐশ্বর্যকে উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন। দ্বিতীয়ত ঐতিহাসিক যুগের সান্নিধ্য বজায় থাকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অকৃপন কল্পনাকে বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রায় নিয়ে আসার সুবিধা ভোগ করেছেন। তৃতীয়ত এই জাতীয় উপন্যাসে ইতিহাসের ছায়য় পরিবার জীবনের যে রুপঅঙ্কিত হয়েছে তার সঙ্গে বঙ্কিম সমকালের সমাজ পরিবারের একটা যোগসূত্র রচনা করাও সম্ভবরক হয়েছে। চতুর্থত জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার আকাঙ্কা বা গনবিদ্রোহের রুপাঙ্কনের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের আড়াল বর্মের মত কাজ করেছে। পঞ্চমত জাতির অতীত সম্বন্ধে একটা ভালোবাসা গৌরববোধ ইত্যাদিও এই জাতীয় প্রসঙ্গ নির্বাচনের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর মূলত এক বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষে হৃদয়স্থাপনের কাহিনী। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় যে চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনীর ত্রিভূজ প্রণয়সমস্যা এই উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনা আধারে পরিস্ফটিত হয়েছে। যে ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্রয়ে এই উপন্যাসের প্লটনির্মিতি তা হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সুবে বাংলার নবাব মীরকাসিমের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পটভূমিকা সময়কালের বিচারে সেটা দাঁড়ায় ১৭৬৩-৬৪ খ্রীঃ। উপন্যাসটির ঘটনা উৎস বা তথ্য উৎস সম্পর্কে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের বিজ্ঞাপন অংশে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারত বর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের উল মতাক্ষরীন্ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজী অনুবাদ আছে ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথা ও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবত্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বর্ণিত ইতিহাস ঘটনা সংগ্রহের উপায় খুব একটা মসৃণ ছিল না।

উপন্যাসের প্লট পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ সময়েই ঐতিহাসিকও অলৌকিক বিষয় সন্নিবেশের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাছাড়া বাঙালীর বীরত্ব ও মহনীয়তা প্রদর্শনের বাসনা বরাবরই তাঁর মনে সচেতনভাবে জাগরুক ছিল। অথচ নিজের সমকালীন বা

পারিপার্শ্বিক জীবন পরিমন্ডলের মধ্যে তিনি সে সবের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ঘটাতে বাস্তবিকই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাই বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা এই দুটি উপন্যাসের পর চন্দ্রশেখর তিনি আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। এই উপন্যাসে ইতিহাসের একান্ত আশ্রয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল না। চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনী রামানন্দ এই অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলিই ঔপন্যাসিকের মূল আশ্রয়স্থল ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইতিহাসেকে অবলম্বন করার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রোমন্স রস সৃষ্টির অবকাশ পেয়েছিলেন , নিতান্ত সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ শৈবলিনীকে নিয়ে তিনি রোমান্সের পথে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারতেন না। সে কারণেই বলতে হয় যে মীরকাসেম গুরগণ ফস্টর আমিয়ট কাহিনীর মূলসূত্র ঐতিহাসিক হলেও এই উপন্যাসের মানবজীবন অংশের প্রধান তিনটি চরিত্র চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মানস পরিকল্পনার ফসল এবং এই একটি মাত্র কারণেই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সমস্যার ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা গৌণ মুখ্য কাহিনীটি এখানে সর্বতোভাবেই সমাজ সমস্যামূলক। তৎসত্ত্বেও ইতিহাস কাহিনীর সঙ্গে মানবজীবন অংশের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এই উপন্যাসে গ্রথিত হয়েছে তার মূল্যায়নও সমান গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত।

টিপ্পনী

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীরকাসিমের মত ইতিহাসখ্যাত চরিত্রটিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ঘটনায় প্রধান্য দিতে ভুল করেননি। মীরকাসিমের পাশাপাশি কয়েকটি চরিত্রনামও এই উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনাধারা অনুসরণ করেছে। নবাবের সঙ্গে ১৭৬৩-৬৪ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর সংঘটিত যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল যথাযথ মাত্রায় ও মর্যাদায় উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত নিকট অতীতের ঘটনা বলে ঐতিহাসিক তথ্যের বিরলতা থাকলেও তথ্যগত সত্যতা প্রায় অভ্রান্ত। ইতিহাসের এই তথ্যগত অভ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে হিসেবে এখানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কার্যকারণ ধারাকে বঙ্কিমচন্দ্র অবিকৃত রেখেছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাসিমের ঐতিহাসিক জীবনের সঙ্গে দলনীবেগমের কাল্পনিক কাহিনী সংযুক্ত হওয়ার দরুণ ইতিহাসের শুষ্ক আবেগবিরহিত ঘটনায় প্রাণের উত্তাপ ও হৃদয়াবেগ সঞ্চারিত হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক রসস্ফূতিতে যা একান্ত জরুরী।

তবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিম দলনীর এই রোমান্সজাতীয় উপকাহিনীকে প্রতাপ শৈবলিনী চন্দ্রশেখর ঘটিত প্রধান উপন্যাস কাহিনীর সঙ্গে বলিষ্ঠ শিল্পকুশলতায় মিলিয়ে দিতে পেরেছেন একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না ফলে চন্দ্রশেখ র উপন্যাসে ইতিহাসের একপ্রকার বিচ্ছিন্ন অবস্থান খুব সহজেই লক্ষ্য করাযায়। ইতিহাস অংশ ও মানবজীবন অংশের হরগৌরী মিলনেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে সৃষ্ট হয় ঐতিহাসিক রস। সুতারাং ইতিহাসের অভ্রান্ত অনুসরনই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার একতম শর্ত নয় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন উপন্যাস উপন্যাস ইতিহাস নহে। আনন্দমঠ তৃতীয় প্রকাশ ভূমিকা অংশ। অ্যারিস্টটলও তাঁর পোরেটিক্স্ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- the his to rian records while the pocf creaes তিনি আরও বলেছিলেন poctry is moru philosophical thar history

তবে একথা সত্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নবাবী আমলের রীতি নীতি বৈভব ঐশ্বর্য ইত্যাদিকে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসেপ্রায় অকৃত্রিমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতিহাসের আর একটি নিরপেক্ষসত্যকেও বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে অত্যন্ত সততার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন - সেটি হল অষ্টাদশ শতকের নবাবেরা যখন তাঁদের রাজনৈতিক শত্রুর সঙ্গে প্রত্যক

টিপ্পনী

সংগ্রাম করেছেন তখন কোন জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেননি লড়াই করেছিলেন ব্যক্তিস্বার্থের তাগিদে অথবা ব্যক্তিমর্যাদাকে কলঙ্কমুক্ত করার অভি প্রায়ে। মীরকাসিমের সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধ হয়েছিলমূলত নবাবের নিজের অধিকার রক্ষা অধিকার বিস্তার ও অর্থনৈতিক স্বার্থের তাগিদেই। যথার্থ কারণেই তাই চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীরকাসেম স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠতে পারেননি। মীরকাসিমের ইংরেজ বৈরিতার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর কূট রাজনৈতিক অভিপ্রায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসমাত্র। তাছাড়া উপন্যাসের শেষংশে মীরকাসেমের যোদ্ধসত্তা অপেক্ষা দলনী শৈবলিনী প্রমুখের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অতিমাত্রিক ভাব বিহ্বলতা মীরকাসেমকে জাতীয়নায়কের দুর্লভ সম্মানপ্রাপ্তি থেকে অনেকখানি দূরবর্তী করেছে। চন্দ্রশেখর নিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় কিন্তু ইতিহাসের স্পন্দনও এখানে নিতান্ত উপেক্ষাযোগ্য নয়। সমালোচকের মতে ইতিহাসকে অস্বীকার না করে তার স্বাদ গন্ধে সমসময়ের জীবন সত্যের সুর তোলা অতীত আর বর্তমানের দুটো ঘোড়াকে এক মুখীচালানোর দুর্লভ কৃতিত্ব বঙ্কিমের।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে অনুমৃত ইতিহাস অংশের বিশ্বস্ততা প্রশংসনীয়। ইতিহাস অংশের প্রধান চরিত্র হলেন মীরকাসিম। অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে আছে গুরগণ খাঁ তকি খাঁ সমরু আমিয়ট লরেস ফস্টর হেস্টিংস প্রমুখ।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবেই তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের প্রাধান্যকে প্রতিষ্টা করতে চাননি তাঁর প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল নর নারীর প্রেমসম্পর্কের এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক রুপাঙ্কন করা। তাই ইতহাসের বিশ্বস্ত প্রবর্তনা সত্ত্বেও চন্দ্রশেখর শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি।

উপক্রমনিকা অংশ – চন্দ্রশেখর উপন্যাস

চরিত্র বা পাত্র পাত্রীর মনোলোকের জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটন বিষয়টি বঙ্কিম উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের পায় সমস্ত উপন্যাসই ঘটনাপ্রধান। ঘটনা বা কাহিনী প্রধান উপন্যাসে অবশ্যই একটা কেন্দ্রীয়ভূমি থাকা আবশ্যক। সরল বা জটিল যাই হোক ঘটনা প্রধান কাহিনী বা আখ্যান নির্মিত হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে আশ্রয়করে সেই সমস্যাটিই হল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভূমি এ সিমস্যার সূত্রপাতেই গল্পের সূচনা তার বেড়ে ওঠা এবং নিশ্চিত ভাবে একটি অনিবার্য সমাধান সূত্রে পৌঁছানো এই সবের যোগফলই হল উপন্যাসের আখ্যান। ঔপন্যাসিক ঐ ঘটনাগুলিকে নির্বাচন করেন উপন্যাসে বিধৃত সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে সমস্যা বহির্ভূত বিষয় বা ঘটনাবলীকে তাই তিনি নির্দ্বিধায় বর্জন করেন। অর্থাৎ একটি বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখেই উপন্যাসে ঘটনার আবর্তন সংঘটিত হয় যদি তার পূর্বে কিছু থাকে তা হল ঐ সমস্যার মুখবন্ধ বা ভূমিকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের যে বৃত্ত বিন্যাস সেখানে মানব জীবন কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসকাহিনীরত্ত একটা সমান্তরাল অবস্থান আছে কিন্তু উপন্যাসের মুখ্য পরিকল্পনায় ঐতিহাসিক অংশ গৌণ বলেই বিবেচিত হবে। মানবজীবন অংশ মুখ্য এবং ঐতিহাসিক অংশ গৌণ এই সিদ্ধান্তের প্রধান পরিপোষক হল আলোচ্য উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশটি মূল উপন্যাস ঘটনায় এক বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষে আসক্তা হওয়ার এক ট্রাজিক পরিণাম প্রদর্শীত হয়েছে। উপক্রমণিকা অংশে রয়েছে সেই ট্রাজিক পরিণাম প্রাপ্তির কৌশলী পূর্বাভাস। শুধু প্রতাপ শৈবলিনী

নয় চন্দ্রশেখর চরিত্রেরও পরিণাম সম্পর্কিত একটি পূর্ব ইঙ্গিত এই উপক্রমণিকা অংশে প্রদত্ত হয়েছে।

উপক্রমণিকা শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল আরম্ভ সূত্রপাত ভূমিকা প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশকে মূল উপন্যাস সমস্যার মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনা হিসেবে গ্রহণ করাই সঙ্গত। এই উপক্রমণিকা অংশে বালিকা শৈবলিনী ও প্রারম্ভিক যৌবনে উপনীত প্রতাপ চরিত্রের বয়সোচিত অনুরাগের বর্ণনা যেমন আছে তেমনি আছে বত্রিশ বৎসর বয়স্ক রুপমুগ্ধ জ্ঞান তাপস চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কিশোরী শৈবলিনীর বিবাহকথা।

টিপ্পনী

উপক্রমণিকা অংশে এই ত্রয়ী চরিত্রের উপস্থাপনার যে শৈল্পিক বিন্যাস পদ্ধতি তার মধ্যেই সমগ্র উপন্যাসের মূল সমস্যাটি বীজাকারে উপ্ত হয়েছে। স্বল্পবয়সী শৈবলিনী ও প্রতাপের কৈশোর প্রেমের মধুর চিত্র দিয়ে উপক্রমণিকা অংশটির সূত্রপাত। প্রতাপ এবং শৈবলিনী জ্ঞাতিসম্পর্কে সম্পর্কিত। কিন্তু তাদের মধ্যে নবমুকুলিত স্নেহভাব নরনারীর স্বাভাবিক প্রণয়েরই প্রাথমিক লক্ষণ বলে উপলব্ধ হয়। তাদের মধুর কথোপকথন অর্থহীন সংলাপ শিশু সুলভ আচরণ বরমাল্যে প্রতাপকে অভিষিক্ত করার বাসনা এসম্ভবই প্রণয়ের অসতর্ক প্রতীক।

বস্তুত শৈবলিনীর যে বয়স তাতে পরিণত নারীর প্রত্যয়িত প্রেমধারণা প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু নারীর সহজাত যে প্রেম স্বত স্ফূর্ততা তা শৈবলিনীর মধ্যে অত্যন্ত প্রকট। বিশেষত সে যুগে স্বল্পবয়সী কন্যার যে বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল তাতে ধরে নেওয়া যেতেই পারে বিবাহ বা স্বামী সম্পর্কে একটা অনভিজ্ঞ ধারণা শৈবলিনীর ছিল। কিন্তু বালিকা বলেই শৈবলিনী এই বাল্যপ্রণয় নিস্বার্থ ছিল না। বরমাল্যের বিনিময়ে প্রতাপকে নিয়ত যুগিয়ে যেতে হত পক্ষী শাবক বা গাছের ফল মূল। অর্থাৎ প্রেমের আত্মনিবেদনে নিস্বার্থপরতা শৈবলিনীর মজ্জাগত স্বভাব নয় তথাপি অসমবয়স্ক দুই অনজিজ্ঞর প্রণয় ক্রমবিকশিথ হতেই থাকল। প্রণয়ের সেই চিত্র অঙ্কন করতে করতেই বঙ্কিমচন্দ্র এরপর মন্তব্য করলেন যে বাল্যপ্রণয়ে বুঝি অভিসম্পাত আছে। এই অভিসম্পাত সম্পর্কিত চিন্তার কারণ সম্ভবত এই যে বালক প্রণয়ী বা বালিকা প্রণয়িনী সমাজ বা পারিবারিক জীবনে নিজেদের বিবাহ ব্যাপারে নিরঙ্কুশ মতপ্রকাশে স্বাধীন নয়। দ্বিতীয়ত বাল্যের সুকোমল অনুভূতিতে ভালোবাসার যে প্রথম আস্বাদন তার পরিণতি দানে সে বা তারা অসহায়। পরিবেশ পরিস্থিতি ও সময়ের ব্যবধানও তাদের মধ্যে অনেক সময় দূরত্ব সূচিত করে। সুতরাং এক্ষেত্রে উত্তর জীবনে সেই মধুর স্মৃতি চিত্তে লালন করা ছাড়া অন্য কোন উপারও থাকে না। আবার প্রতাপ শৈবলিনীর ক্ষেত্রে এই অভিসম্পাত প্রসঙ্গটি আরও একটি কারণে স্পষ্ট মাত্রা পেয়েছে কারণ তারা উভয়ে জ্ঞাতি সম্পর্কে সম্পর্কিত। প্রায় সাবালক প্রতাপ জানত তাদের বিবাহ অসম্ভব আর শৈবলিনী সেই নির্মম সত্য হৃদয় ঙ্গম করল বয় প্রাপ্তা হয়ে। তখন সে অনুভব করল প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল এজন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। মূল উপন্যাস অংশের ঘটনা পর্যালোচনা করলে ও শৈবলিনী চরিত্রের পরিণতির কথা মনে রাখলে শৈবলিনীর পূর্ব উপলব্ধিকে একটি উৎকৃষ্ট হিসেবেই চিহ্নিত করতে হয়। পরবর্তী জীবনে শৈবলিনী প্রতাপবিরহিত এক যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করেছে এবং সুখপ্রষ্ট শৈবলিনী প্রতাপকে ফিরে পাওয়ার সমস্ত আশা নিমূলিত হয়েছে। শৈবলিনীর ভাবেজীবনের অশনি সংকেত এই উপক্রমণিকা অংশেই চকিত চমকে হয়ে উঠেছে। এছাড়াও শৈবলিনী য়ে আমাদের প্রিয় স্বার্থপর এবং প্রতাপের প্রতি তার ভালবাসা যে এক প্রকার মোহমাত্র সে সত্যও উপক্রমণিকা অংশে যথেষ্ট সাষ্টতা লাভ করেছে।

শুধু প্রতাপ ও শৈবলিনীর ক্ষেত্রেই যে বঙ্কিমচন্দ্র উপক্রমণিকা অংশকে মূল উপন্যাসের মুখবন্ধ রুপে ব্যবহার করেছেন তা নয় চন্দ্রশেখরের দেবদুর্লভ আদর্শ চরিত্রের অন্তমূর্লে যে একপ্রকার ইন্দ্রিরাজ রুপমুগ্ধ তা ছিল শৈবলিনীর রুপরাশিতে চন্দ্রশেখরের চিত্ত বিচলন এবং চিরকৌমার্ধব্রত ভঙ্গের ঘটনার তা প্রমাণিত হয়। মূল উপন্যাস অংশের ঘটনায় একাধিক ক্ষেত্রে চন্দ্রশেখর চরিত্রের সেই দিকটি উন্মেচিত হয়েছে।

সুতরাং চন্দ্রশেখর উপন্যাসের উপক্রমণিকা অংশ মূল উপন্যাস ঘটনার বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয় তা বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক উপন্যাস পরিকল্পনারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

টিপ্পনী

শৈবলিনী বঙ্কিম উপন্যাসের এক দুঃসাহসী নারী চরিত্র তার পরিণাম ও শিল্পমূল্য ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান প্রধান পুরুষ ও নারীচরিত্রগুলির একটা বিশেষত্ব আছে। সামাজিক অথবা ইতিহাসের াধারে রচিত চরিত্রগুলির সামাজিক ও পারিবারিক পটভূমিকায় বহিরঙ্কীন পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষনে রত হয়েছেন তখন প্রতিটি পদথেকেই বঙ্কিমচন্দ্র মাবন মনোলোকের ও চরিত্রের অন্তবর্তী বিশেষ বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটন করেছেন। পুরুষের তুলনায় নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রয়াস আরও অনেক বেশী স্পষ্ট উদ্দেশ্য মূলক এবং সত্যি বলতে কি তা বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক জীবন দর্শন ব্যাখ্যার সূত্রস্বরুপ। ইতিহাসের পটভূমিকায় রটিত প্রেমদ্বন্ধ তথা নারী ও নারী চরিত্রটি সেই রকমই একটি সার্থক সৃষ্টি। উনিশ শতকের সমাজ জীবনে এই রকম একটি অসমসাহসিনী স্বাধীন চিত্তা স্পষ্ট বাদিনী বিদ্রোহিনী হিন্দু নারীচরিত্র সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁর শিল্পীজীবনে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে এই নারী চরিত্র টির জন্যই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্লটনির্মিতি সমস্যার তীব্রতা প্রাপ্তি ও সেই সঙ্গে বঙ্কিমপ্রতিভার সফল অগ্নিপরীক্ষা উদ্‌যাপন।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র হল শৈবলিনী। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের মধ্যে এই চরিত্রটিই যোগসূত্র রচনা করেছে এবংতাকে কেন্দ্র করেই ঐ পুরুষ চরিত্র দুটির ভাগ্য আলোড়িত হয়েছে। অন্যদিকে শৈবলিনীকে অবলম্বন করেই এই উপন্যাসে নীতি দুনীতির প্রমক্ষটি উত্থাপিত হয়েছে শুধু তাই নয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা এই চরিত্রটির জন্যই প্রাথমিক ভাবে দ্বিধান্বিত এবং শেষত সেই দ্বিধাকে দূর করার প্রয়াস উপন্যাসে আদ্যন্ত বিযৃত এই চরিত্রটি তাই সঙ্গত কারণেই একটি পৃথক শিল্পমাত্রা অর্জন করার যোগ্যতা লাভ করেছে।

উপন্যাসের সূচনায় উপক্রমণিকা অংশে শৈবলিনী ও প্রতাপের মধ্যে বালক বালিকাসুলভ অপরিণত প্রেমের কৌতুক কর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু সেই কৌতুকের মানেই এক সময় গাম্ভীর্যত্ত প্রবেশ করেছে। অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা শৈবলিনীর মনের নিভৃত কোণে কিশোর নায়ক প্রতাপের বর চিত্র ক্রমউদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু প্রতাপ জানত সমাজ ইতোমধ্যেই তাদের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্কের এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে সুতরাং শৈবলিনীর সঙ্গে তার বিবাহ অসম্ভব। প্রাচীরের এই বাধা কতখানি দুর্খোচ্য তা বয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনীও হৃদয় দর্শন করল বুঝল প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল এজন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। (উপক্রমণিকা ২য় পরিচ্ছেদ)।

প্রতাপের প্রেম আর শৈবলিনীর এই হঠাৎ উপলব্ধির ফলশ্রুতি হল উভয়ের গঙ্গায়

আত্মবিসর্জনের অঙ্গীকার গ্রহণ। কিন্তু শৈবলিনী শেষ পর্যন্ত তার অঙ্গীকারের মর্যাদা রাখতে পারেনি। নিমজ্জমান প্রতাপকে দেখে তার অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটল। নিজের প্রিয় জীবনকে রক্ষা করার অজুহাতে সে ভাবল প্রতাপ আমার কে ? কথায় ও কাকে এই বৈপরীত্যের কারণে চরিত্রটিকে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আবার প্রতাপ সম্পর্কে এই স্ববিরোধী মনোভাব আপাত দৃষ্টিতে বালিকা শৈবলিনীর মৃত্যু ভীতির পরিণাম বলেও মনে হতে পারে। অবশ্য মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা স্থায়ী প্রবণতা শৈবলিনীর চারিত্রিক সংগঠনের একটি অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য।

টিপ্পনী

তারপর শৈবলিনীর একদিন বর মিলল সে বর দেবদুর্লভ চন্দ্রশেখর । শৈবলিনীর অমূল্য রূপরাশিই ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের চিরকৌমার্যব্রত ভঙ্গের কারণ হয়েছিল। এই চন্দ্রশেখরের সংসারে শৈবলিনী স্বল্পকালের জন্য হলেও অতীত যন্ত্রনাকে বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমন্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অশুভক্ষণে চন্দ্রশেখর তাহার পাপিগ্রহণ করিয়াছিল। শৈবলিনীর নিয়তি এই যে সে থাকে ভুলতে চাইছল সেই প্রতাপ অনুগত শিষ্যের মত চন্দ্রশেখরের চার পাশে ঘুরতে লাগল আবার শৈবলিনীর হৃদয়ে জাগ্রত হল পূর্ব প্রণয়ের জ্বালাময় স্মৃতি। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই পরবর্তীকালে শৈবলিনী তিরস্কারের ভাষায় প্রতাপকে বলেছিল কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে ? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে ?

যাঁকে আশ্রয় করে শৈবলিনী অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নতুন করে বাঁচতে চেয়ে ছিল সেই চন্দ্রশেখর জ্ঞানী ধার্মিক সচ্চরিন নিষ্ঠাবান এবং শৈবলিনীর সুরক্ষকও বটে কিন্তু নীরস চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে নারী জীবনের কামনার ধন প্রেম নেই উচ্ছাস নেই আবেগ নেই সর্বোপরি নেই সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর প্রতি তিলমাত্র মনোযোগ। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কাছে সম্প্রখ আদায় করেন হয়তো ঐশ্বর্যমন্ডিত প্রেমও কিন্তু সখ্যরসের সমপ্রাণতা সহ মধুররসের যে একাত্ম সহাবস্থনে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে সেই জীবনবৃত্তে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সেজন্য জীবনের এক চরম মুহূর্ত শৈবলিনীকে একদিন বলতে শোনা যায় আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাঁহার সব। গ্রন্থকীট জ্ঞানতাপস চন্দ্রশেখর নিজেও বুঝেছিলেন তাঁর সারা জীবনের অর্জিত জ্ঞান তপস্যার সত্যফল সংসারী নারীর চরম কাঙ্কিত বস্ত নয় কাঙ্কিত বস্তু হল স্বামীপ্রেম। অথচ চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে সেই কামনার বস্তুটি উপহার দিতে পারেননি। সেই অক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে চন্দ্রশেখর বলেছেন বিশেষ আমিও সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকের রাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমনী মুখপদ্ম কি জীবনের সার ভূত করিব ? ছি ছি তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে ?

ফস্টবের সঙ্গে ভীমাপুষ্করিনীতে শৈবলিনীর রসিকতা লালাসাজাত নয় কিংবা ফস্টর কর্তৃক তার অপহরণ নারীজীবনের চরম কলঙ্ক হলেও শৈবলিনীর প্রত্যাশা কিন্তু ভিন্ন রকম। সম্পর্কে শৈবলিনী উপন্যাসের এক স্থলে প্রতাপকে বলেছে যে স্বামী বিছিন্ন হয়ে যদি কোন দিন সে প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তার গৃহত্যাগ ফস্টর সেখা উপলক্ষ্যমাত্র শৈবলিনীর ভাষায় ফস্টর আমারকে? ফস্টরের নৌকায় সুন্দরীর সঙ্গে কথাবার্তায় মধ্যেও চন্দ্রশেখরের প্রতি শৈবলিনীর ঔদাসীন্য ও প্রতাপের প্রতি আসক্তির চিত্রটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। শৈবলিনী সুন্দরীকে বলেছে যে সে কিসের আশায় ঘরে ফিরে যাবে সেখানে নপিতা নমাতা ন বন্ধু। সুন্দরী এজন্য শৈবলিনীকে পৃথীবীর মধ্যে নিকৃষ্টা ও পাপিষঠা বলে অভিহিত

করেছে কিন্তু শৈবলিনী নির্বিকার। পতিব্রতা সংসারী নারীর সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ব এত বেশী যে স্বামীলাভ করেও সে স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি। আসলে চন্দ্রশেখরকে সে শুদ্ধা করে কিন্তু ভালোবাসতে পারে না। অকপট শৈবলিনী তাই স্বামী কে বলেতে পেরেছিল আমি ইচ্ছা পূর্বক ফস্টরের সঙ্গে চলিয়া আমিয়া ছিলাম। এবং তার সেই চলে আসা শৈবলিনীর নিজস্ব উক্তিতে প্রতাপের জন্য।

টিপ্পনী

বস্তুত পক্ষে শৈবলিনী নৈরাশ্যবাদী নয় আশাবাদী। জীবনের ঘাত প্রতিঘাত যন্ত্রণা সমস্যা বহু প্রতিকূলতার কন্টকে আকীর্ণতার জীবন জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় না ঠিকই কিন্তু শৈবলিনী বোধ করি তার জীবনের পথে নিজেই কন্টক বিছিয়ে দিয়েছিল তাতেই তার পদযুগল রক্তাক্ত।

শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্নিবার প্রেম আকর্ষণে নিজের গৃহ আঙিনায় কন্টক প্রোথিত করে অভিসারের দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার অনুশীলন করেছিলেন শৈবলিনীও সেই রকম পরকীয়া নারিকার মত আকাঙ্কিত জীবন দেবতার উদ্দেশে অনিশ্চিত জীবন অভিসারের একাধিক অনুশীলনকার্যে রত হয়েছিল। বাস্তববুদ্ধিতে

শৈবলিনীর গৃহত্যাগ একপ্রকার অবিমৃষ্যকারিতা। বিশেষত অষ্টাদশ শতকের পটভূমিকায় যখন প্রায় মধ্যাযুগীয় অনুশাসনের বেড়াজালে নারীজমির জীবন সর্বপ্রকারে আবদ্ধযখন গৌরীদান কৌলীন্যপ্রথা সতীদাহ ইত্যাদির সগৌবর প্রচলন যখন অশীতিপর বৃদ্ধের হাতেও কন্যাসমর্পম ছিল অতীব পূণ্যের কাম্য তখন বিবাহিতা শৈবলিনীর অন্য পুরুষে আসক্তি সামাজিক দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে গর্হিত অপরাধ। শৈবলিনী অপেক্ষা যথেষ্ট বয়োক্যে ষ্ঠ হলেও তৎকালের বিচারে চন্দ্রশেখর ছিলেন যে কোনো পতিব্রতা রমঊর ঈর্ষ্যপীয় স্বামী সম্পদ আসলে শৈবলিনীর সমস্যা অন্যখানে নিতান্ত বালিকা বয়সেই শৈবলিনীর প্রেমাস্বাদন সম্পন্ন হয়েছিল যেমন হয়েছিল শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের রাজলক্ষীর রাজলক্ষীর প্রেমের সমাপ্তি বিবাহের মধ্যে সংঘটিত হয়নি সত্যি কিন্তু সেই প্রেমের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি সে শ্রীকান্তের কাছে পেয়েছিল। বালিকা বয়সের প্রেম না হলেও রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির বিনোদিনীও সেই সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী। বিহারীর নির্লিপ্ততা আদর্শপরায়ণতা অথবা প্রেম প্ত্যাখ্যান বিনোদিনীর মনে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছিল প্রেমের স্নিগ্ধ আলোকবর্তিকার পরিবর্তে যা হয়ে উঠিছিল বিধ্বংশী বহ্নিশিখা আর বিহারী র প্রেম স্বীকৃতিতেই সেই বিনোদিনীই হেয় উঠেছে বীতকাম প্রেম সার্বিকা প্রেম তখন তার কাছে জীবন পথের আলো চরিত্রহীন উপন্যাসে শরৎ চন্দ্রের বক্তব্যছিল যে ইঙ্গিনের যে ইঞ্জিনের যে শক্তি ইঞ্জিনকে সম্মুখ দিকে চালিত করে সেই একই শক্তি তাকে পশ্চাদ্‌গামীও করে। প্রেমও যখন মঙ্গলশক্তি আত্মার জাগরণ পারস্পরিক সম প্রাণতা বা সমানুভূতির দ্যোতক তখন সেই প্রেম সম্মুখগতির দিব্য শক্তি আর প্রেম কখন অধোগামী কোপন স্বভাব এবং ইন্ডিয়কামনার বহিঃপ্রকাশ তখন সেই মোহগ্রস্ত প্রেম মানুষকে নিয়ে যায় ধ্বংসের কিনারায়। তখন সেই প্রেম মঙ্গলশক্তি নয় ইন্দ্রিয়জ কামনা। প্লেটো মনে করেন এই অবস্থায় তাহলে শৈবলিনীর প্রেম কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত?

শৈবলিনীর পরপুরুষাসক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেম আখ্যা দিতে চাননি একে তিনি মনে করেছেন স্বৈরিনী রমনীর ব্যভিচার উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রতাপ যেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিনিধিস্তানীয় চরিত্র হয়ে উঠে তাই বলেছে তোমার মতো পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিতে নাই। অন্যদিকে শৈবলিনী যখন প্রতাপেই নিবেদিত প্রাণ বলে নির্দ্বিধ স্বীকারোক্তি করেছে কিংবা বলেছে

প্রতাপকে পাওয়ার জন্যই সে চন্দ্রশেখরের গৃহ পরিত্যাগ করেছে তখনও প্রতাপের আচরণে প্রেম বা সহানুভূতির লক্ষণ প্রকাশিত হয়নি বরং বিরুপতা বা ভীতির সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু শৈবলিনী প্রতাপময়। প্রতাপের জন্যই তার জীবন বিপর্যপ্ত প্রতাপের প্রতিতার অভিয়োগ তাই জ্যামুক্ত শরের মতো তীব্র গতিময়। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রতিটি প্রশ্ন তীক্ষ্ণমুখ আমার এদুর্দশা কাহা হতে? তোমা হতে কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে তুমি প্রতাপকে তার শ্রেয় ও প্রেয় নির্বাচনে শৈবলিনীর কোন দ্বন্ধ নেই শৈবলিনীর পিছুটান কেবল চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখরকে নিয়েই শৈবলিনীর যত পাপবোধ। চন্দ্রশেখর প্রতাপের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্ধী নয়। শৈবলিনীর স্বামী হয়ে ওঠা চন্দ্রশেখর জীবনে একটি দৈবাৎ ঘটনা। চন্দ্রশেখর জ্ঞান ওএকবৃন্তে প্রস্ফুটিত দুটি কুসুম প্রতাপ শৈবলিনীকে বিচ্ছিন্ন করেননি। সেদিক থেকে নিরপরাধ চন্দ্রশেখরকে সংসার সুখ থেকে বঞ্চিত করার পাপবোধকে শৈবলিনী এড়িয়ে যেতে পারেনি।

শৈবলিনীর চারিত্রিক সংগঠন সাধারণ নারীসুলভ নয়। দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে বাসরকক্ষে সলজ্জিতা প্রবেশ করার মানসিকতা তার চিলনা। তার প্রেমনিবেদনেও দীনা রমনীর জীবন মরণ মম আজি তব হাতে সোমের প্রতিতারা বীরাঙ্গনাকাব্য এই কাতরোক্তি নেই আছে উচ্চকণ্ঠ দাবি ও অধিকারবোধ। শুধু তাই নয় বিবাহিতা হয়ে ও অন্য এক বিবাহিত পুরুষকে মিথ্যা স্বামী পরিচয়ে পরিচায়িত করার দুঃসাহসিকতাও ও প্রেমে অশঙ্কিনী হয়ে ওঠার দৃরচিত্ততারও সে অধিকারিনী। উপন্যাস কাহিনীর তৃতীয় খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শৈবলিনী যখন মীরকাসিমের সম্মুখে ইংরেজ কর্তৃক অপহৃত প্রতাপের উদ্ধার ব্যাপারে নবাবের সাহায্য প্রর্থনা করেছে তখন সে নিজেকে প্রতাপের স্ত্রী বলে উল্লেখ করেছে। এই পরিচয় প্রদান যে নিতান্ত কৌতুকজনিত বা খামখেয়ালিপনা তা নয়। এর পিছনে রয়েছে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ছাপও। এটা স্পষ্টতা পেয়েছে ঐ একই পরিচ্ছেদের শেষাংশে যেখানে নবাব শৈবলিনীকে যে কোন বিপদে তাঁর কাছে বিনা দ্বিধায় দরবার করার আশ্বাস প্রদান করেছেন সেই অংশে শৈবলিনীর প্রগল্‌ভ স্বগতোক্তি আসিব বৈকি হয়ত রুপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।

শৈবলিনী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার র্নিভীকতা। শুধু নির্ভীকতা নয় উপস্থিত বুদ্ধি কার্যসমাধার জন্য একাগ্রতা ও এ্যাড্‌ভেঞ্চার প্রিয়তা তাকে সাধারণ নারীত্বের স্তর থেকে অমেকটাই উর্ধ্বায়িত করে তুলেছে। তাই প্রতাপও স্বীকার করতে বাধ্য হেয়ছে শৈবলিনী বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে। তৃতীয় খন্ড ৫ ম পরিচ্ছেদ। যে ক্ষিপ্রতা ও অসমসাহসিকতায় শৈবলিনী ইংরেজের নৌকা থেকে প্রতাপকে উদ্ধার করেছিল তা নিসন্দেহে কোন অসাধ্যসাধন পটীয়সীর কাঝ। অতপর চন্দ্রালোকিত গঙ্গা বক্ষের নয়নমনোহর সোন্দয্যের মামখানে সন্তরণরত পরেতাপ ও শৈবলিনী নানান তুলনায় উপমায় ও দার্শানিকসুলভ আলোচনায় জীবনের উদ্দেশ্য ধর্ম প্রকৃতি পরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে প্রাসঙ্গিকঅপ্রাসঙ্গিক কথোপকথনে রত হয়েছে। এরই মধ্যে শৈবলিনীর এক আকস্কিক ভাবনা যেন তার জীবনের ট্রাফিক অবস্থার ভাষ্যস্বরুপ হয়ে ওঠে এজনের তো তল আছে আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি। শৈবলিনীর ধারণা ছিল প্রতাপকে সে হয়তো এবার আপনার করেপাবে। কিন্তু ঘটনার অমোঘ নিয়ন্ত্রণে শৈবলিনী প্রতাপনির্দেশিত যে শপথবাক্য উচ্চারণে বাধ্য হয়েছে তা য়েন নিজের মৃত্যু দন্ডাজ্ঞাপত্রে নিজেরই স্বাক্ষরপ্রদানের সামিল। সেই মৃত্যুপরোয়ানাস্বরুপ শপথ বাক্য হল প্রতাপ শুন তোমকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শু তোমার শপথ আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি

টিপ্পনী

হইতে আমার সর্বমুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে শৈবলিনী জরিল।

তবে একথা সত্য শৈবলিনীর কণ্ঠোচ্চারিত পূর্বোক্ত শপথ বাক্য শৈবলিনীর মানস অনুমোদিত ব্যাপার নয় প্রতাপকে অকারণ জলমগ্ন হয়য়া থেকে বিরত করার জন্যই ঐ শপথ। আবার বিপরীত দিক থেকে বলা যায় প্রতাপের প্রস্তাবক্র মে নিজেকেও মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া থেকে অব্যাহিতি পাওয়ার একটি আপাত বিকল্প ছিল শপথ বাক্য উচ্চাপণ। উপন্যাসে একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে শৈবলিনী মৃত্যু ভীত।

টিপ্পনী

প্রতাপের অজ্ঞাতে শৈবলিনীর আত্মগোপন পর্যায় থেকে শৈবলিনীর জীবনের অন্য এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। শৈবলিনীর পর্বতোপরিগমন। ঘোরতর প্রাকৃতিক দুর্যোগ রহস্যময় পুরুষের অযাচিত সাহায্য লাভ গুহার মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ রমানন্দস্বামীর সৎপরামর্শ। শৈবলিনীর পাপমোচনের জন্য চন্দ্রশেখরের বিধান প্রদান সমস্তই ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পূর্ব সংসার আশ্রমে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার ভিন্ন এক ইতিবৃত্ত সেখানে প্রতাপ শৈবলিনী দ্বারা নিন্দিত চরিত্র আর চন্দ্রশেখর মহনে। নিশিদিন নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার তপোফলে শৈবলিনীর চন্দ্রশেখর সম্পর্কে যে বোধোদয় হল তা এই রকম এ কি রুপ এই দীর্ঘ শালতরু নিন্দিত সুভুজ বিশিষ্ট সুন্দর গঠন সুকুমার বলময় এদেহ যে রুপের শিখর এই যে ললাট প্রশস্ত চন্দন চর্চিত চিন্তা রেখা বিশিষ্ট এ যে সরস্বতীর শয্যা ইন্দ্রের রণভূমি মদনের সুখকুঞ্জ লক্ষীর সিংহাসন ইহার কাছে প্রতাপ ছি ছি। উপন্যাসের চতুর্থ খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে শৈবলিনীর শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বীভৎস ভয়ংকর কালান্তক নরক যন্ত্রণাভোগের মাধ্যমে। সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে মহাকায় পুরুষ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতপালনের কথা বললেন। এরপর শৈবলিনীর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধানের প্রস্তুতি। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করি সপ্তম রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন স্বামীধ্যান শেষে শৈবলিনী দেখিলেন শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান আচে। সেই জ্ঞান সহায়তায় শৈবলিনী মহাকাশের কোন এক রহস্যময় লোকে কত বয়ংকর ভীষণ ত্রাসসঞ্চারকারী স্তরে বিচরণ করতে লাগল এবং স্বামী দেবতার চরণ যুগল একান্ত ভাবে শিরোধার্য করার বাসনা প্রকাশ মাত্র পুতিগন্ধের পরিবর্ত্তে কুসুম মগন্ধ ছুটিলা বোধ হইল এমৃত্যু নহে জীবন আর দেখল সম্মুখে পূর্ণ চন্দ্রবৎ প্রভাতান্ধ কারে আলোক বিকীর্ণ করছেন ব্রক্ষচারী বেশেচন্দ্রশেখর । চন্দ্রশেখর তখন যেন শৈবলিনীর ত্রাণকর্তা।

অতঃপর শৈবলিনীর মানসিক বিকৃতি বেদগ্রামে প্রত্যাবর্তন এবং মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় যোগবল আরোগ্য প্রাপ্তি ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শৈবলিনী তখন বাঙালী পরিবারের কল্যাণী বধূতে রুপান্তরিত হওয়ার প্রয়াস করেছে। শৈবলিনীর কলঙ্কমুক্তিঘটেছে। খরেন্স ফস্টর কতৃক তার চারিত্রিক শুদ্ধতার উল্লেখে। সন্দেহ নেই বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠার দুরপনে কলঙ্ক থেকে মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রমান সাবুদ সংগ্রহ করেছেন এবং তাকে অনুতাপের তীব্র দহনে দগ্ধ করে স্বামীর পদ পঙ্কজকে বিবাহিতা রমনীর শেষ নিশ্চিন্ত আশ্রয় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কিন্তু শৈবলিনীর মনের গভীরে প্রতাপের জন্য ভালোবাসার যে বীজ শৈশবেই উপ্ত হয়েছিল তার মূলোৎপাটন করতে কখনোই সক্ষম হয়নি। সেজন্যই বেদ গ্রামে চন্দ্রশেখরের সংসারে স্ত্রী রুপে পুনর্বাসনের অব্যবহিত পূর্বেও সে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে তার পূর্ণ রোগমুক্তির কথা স্বামীর কাছে গোপন করে প্রতাপের মতামত জানতে চেয়েছে। আদর্শবাদী প্রতাপ শৈবলিনী সুখী ভবিষ্যৎ কামনা করে আশীর্বচলও উচ্চারণ করেছে। প্রতাপ চেয়েছিল শৈবলিনী সুখী হোক কিন্তু কঠোর প্রায়শ্চিত্তও শৈবলিনীকে চিত্ত শুদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারেনি। আর পারেনি বলেই এস্থলে তার ।কপট মন্তব্য আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে অমার সুখ

নাই।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শৈবলিনী যখন নিজের দুরদৃষ্টের জন্য প্রতেপকে সর্বতোভাবে দায়ী করেছিল তখন বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ প্রতাপ মন্তব্য করেছিল ইদানীং তোমাকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে

আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। আর উপন্যাসের অন্তিমে ষষ্ঠ খন্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে এসে প্রতাপ উপলব্ধি করল শৈবলিনী তখনও সর্পিণীতুল্যা। সুতরাং এবার বেদ গ্রামত্যাগ নয় জীবন থেকে নিষ্ক্রমণই তার অনিবার্য ভবিতব্য। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপের মৃত্যু বীরযোদ্ধার মৃত্যু নয় সে মৃত্যু জীবন বিসর্জন আকাঙ্খী প্রেমিক শ্রেষ্ঠ প্রতাপের আত্মবলিদান। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র প্রতাপের জীবনে শৈবলিনী তাই নিয়তিস্বরুপা।

শৈবলিনী সংসার আশ্রমে পুনপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছে। জ্ঞানী বিবেচক চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর থারুীয় স্বলনকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতের দেখেছেন কিন্তু মানব মনস্তত্ত্ব এত সহজে এ জাতীয় জীবন পরিণামকে সরলরৈখিক ভাবে গ্রহণ করে না। বঙ্কিমচন্দ্রই মনে করতেন দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝখানে তৃতীয় চরিত্রের উপস্থিতি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝখানে একটা অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে তোলে সন্দিগ্ধতার পথ দেয়। প্রতাপের স্মৃতি শৈবলিনীর জীবন থেকে মুছে যাওয়ার নয় আর চন্দ্রশেখর যতই দেবদুর্লভ চরিত্র হোন না কেন তাঁর মনের প্রতাপকে কেন্দ্রকরে শৈবলিনীর প্রতি একপ্রকার সন্দেহ নিশ্চিত ভাবে জাগবেই সুতরাং দাম্পত্যজীবন সেই খন্ডিত সম্পর্কেই লুকোচুরি খেলা।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের ঘটনাবীরায় শৈবলিনী চরিত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য আছে। চরিত্রইট উপন্যাস ঘটনায় আদ্যন্ত উপস্থিত। শৈবলিনীর কারণেই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে সৃষ্ট হয়েছে নানান ঘাত সংঘাত নাটকীয় ঘটনা বেগ কৌতূহল ও উৎকণ্ঠ। চরিত্রটি প্রায় সর্বত্রই উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর কে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। শৈবলিনীর জন্যই চন্দ্রশেখরের জীবন ব্রত ভঙ্গ হয়েছে আজীবন লালিত অধ্যয় নকার্য বিঘ্নিত হয়েছে এমনকি দিশেহারা হারা হয়ে জীবনের শান্তি অনুসন্ধানে অনির্দেশের পথে যাত্রা করতে হয়েছে। প্রতাপের জীবনেও শৈবলিনীর প্রভাব ব্যাপক এবং গভীরবিস্তারী। তর জন্যই প্রতাপের জীবন কক্ষুচ্যত গ্রহের মত দিক্ ভ্রান্ত এবং মৃত্যু মুখী।

উপন্যাসের নাম চন্দ্রশেখর অনেকের মতে চন্দ্রশেখর ই এই উপন্যাসের নায়ক তরিত্র। কিন্তু নায়কত্বের বিচারে শৈবলিনীর ট্র্যাজিক যন্ত্রনামথিত জীবনের পুর্নর্মূল্যায়নও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এ্যালার উাহ্স নিকল নাটকের নায়কচরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নারী চারত্রেরও নায়ক ত্বের মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনায় কথা বলেছেন সেক্ষেত্রে নারীচরিত্রের মধ্যে বা পুরুষায়িত গুনাবলীর উপস্থিতি থাকাটা জরুরী। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনী চরিত্রের মধ্যে সেই আছে।

‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের নির্ধারণ

উপন্যাসের নায়ক চরিত্র বলতে আমরা সেই চরিত্রকেই বুঝি যে চরিত্র মূল উপন্যাসে ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র যাকে কেন্দ্র করে ঘটনার অগ্রগতি ও পরিণাম নির্দিষ্টতা এবং অন্যান্য

টিপ্পনী

চরিত্রের সমাবেশ ও সেই সঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন হয় অভিব্যক্ত এক কথায় বলা যায় নায়ক চরিত্রই হল উপন্যাসের মূল ঘটনার নিয়ন্ত্রক শক্তি। উপন্যাস কাহিনীতে নায়ক চরিত্রের বিকাশ মান তাকে সুস্পষ্ট করাই হল ঔপন্যাসিকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সাধারণ বিচারে ঘটনাপ্রধান এবং সেই ঘটনা প্রধান উপন্যাস গুলির নামকরণ মূলত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কেন্দ্রিক। এই প্রধান চরিত্রকে যদি নায়ক চরিত্র হিসেবে ধরে নেওয়া যায় তাহলে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের প্রধান দাবীদার হয়ে ওঠেন স্বয়ং চন্দ্রশেখর।

টিপ্পনী

আপাত দৃষ্টিতে চন্দ্রশেখর উপন্যাসেটি ইতিহাসের আধারে রচিত নর নারীর জটিল প্রণয় সমস্যা ও ব্যক্তিসম্পর্কের নিগূঢ় রহস্য ময়তার কাহিনী। আরও করে বললে বলতে হয় এক বিবাহিতা রমণীর অন্য পুরুষে প্রাণমন সমর্পণ ও তজ্জাত এক গভীর দ্বন্দ্ব মূলক আখ্যান হল এই উপন্যাসটি। চন্দ্রশেখর প্রতাপ শৈবলিনীর ইতিহাস বহির্ভূত এই বাস্তবজীবন সমস্যার বাইরে এই উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক অংশ রয়েছে সেই ইতিহাস অংশের নায়ক অবিসম্বাদিত ভাবে সুবে বাংলার নবাব মীরকাসিম। কিন্তু যেহেতু আলোচ্য উপন্যাসের মূল পরিকল্পনা এবং ঘটনা পরিনামের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই চরিত্রটি নয় সেই হেতু সামাগ্রিক ভাবে এখান কার ঘটনার কেন্দ্র বিন্দুতে মীরকাসেমের ভূমিকা নায়কোচিত সমুন্নতি লাভ করেনি। সঙ্গত কারণেই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের অনুসন্ধান মূলত দুটি চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেতে হয় চরিত্র দুটি হল চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ।

চন্দ্রশেখর চরিত্রটি যে আলোচ্য উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহনেই। চরিত্রটির মধ্যে নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাহিনী অংশে চরিত্রটির উপস্থিতিও সূচনা থেকে প্রায় সমাপ্তি পর্যন্ত। এই উপন্যাসের ইতিহাস অংশের সঙ্গেও চরিত্রটির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্র স্থাপন করেছেন। সর্বেপরি এই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সম্পর্ক অর্ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শৈবলিনী সম্পর্কগত দিক থেকে চন্দ্রশেখরের স্ত্রী

স্বামী হিসেবে চন্দ্রশেখর চরিত্রের অসম্পূণতা সংসার উদাসীন্য স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থতা বিশেষ করে জ্ঞান তাপস চন্দ্রশেখরের ভালোবাসার উচ্ছ্বাসবিহীন নীরস আচরণ চরিত্রদুটির মধ্যে দাম্পত্য প্রীতির সঞ্চার করতে পারেনি বলেই এই উপন্যাসে শৈবলিনীর বিযগামিতা এত সহজতর এত সহজতর হয়ে উঠেছে। সুতরাং শৈবলিনীর

পদস্থলনে ও উপন্যাসের জটিলতা বিস্তারে চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত দায়িত্ব মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। সেদিক থেকে উপন্যাসের ঘটনা ধারায় গতি সঞ্চারে ও বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বামীরুপে প্রেমের ট্র্যাজিক জাতীয় ফলভোগে এবং মানসিক যাত সংঘাতে চন্দ্রশেখর যতেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছেন।

কিন্তু তবুও মনে হয় চন্দ্রশেখর এই উপন্যাসের ঘটনাধারার অদ্বিতীয় নিয়ন্ত্রীশক্তিতে রুপান্তরিত হতে পারেননি চরিত্রটির গতিবিধির মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা চন্দ্রশেখর পন্ডিত। জ্ঞান তাপস ভালোমানুষ কিন্তু তিনি রুপাসক্ত। রুপাসক্ত হয়েই তিনি ব্রক্ষাচর্যব্রত ত্যাগ করে রুপসী শৈবলিনীকে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু সংসারী মানুষের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য ছিল না বলে তিনি

পত্নীপ্রেম লাভ করতে ব্যর্থ হন। চন্দ্রশেখর নিজেও তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই সচেতনতা থেকেই তাঁর উপলব্ধি আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ন সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তবে নীতিবিদ্ অপাপবিদ্ধ চন্দ্রশেখর ও এক সময় পত্নীপ্রেমের তাড়নাতে দিগ্‌প্রান্ত হয়েছেন। শৈবলিনী অপহরণের পর মানসিক যাতনাক্লিষ্ট চন্দ্রশেখর বহুক্লেশ সঞ্চিত পুস্তক রাশি অগ্নিতে ভস্মীভূত করেছেন এবং শৈবলিনী শূন্য সংসার ত্যাগ করে অনিদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। শৈবলিনীর আয়্নিক সংকটকালেও চন্দ্রশেখর বারবার হয়ে উঠেছেন ত্রাণকর্তা। অবশ্য এই পর্বে চন্দ্রশেখরের জীবনে রমানন্দ স্বামীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রমানন্দ স্বামীর যোগ্য শিষ্য হয়ে ওঠার পর চন্দ্রশেখর মূলত তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন ফলত চন্দ্রশেখরের ভূমিকা সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই ম্লান প্রতিভ।এমনকি রমানন্দ স্বামীর প্রত্যক্ষ উদ্যোগেই মানসিক বিকার গ্রস্তা শৈবলিনীর রোগমুক্তি এবং শেষত শৈবলিনীকে নিষ্পাপ জ্ঞানে সংসার আশ্রমে স্ত্রীর মর্যাদায় পুন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। উপন্যাসের এই পর্বে সংসার আসক্তির পৌন পুনিক উল্লেখ চরিত্রটির পূর্ব স্বভাবের সঙ্গে সঠিক অর্থে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি বলেই মনে হয়। চন্দ্রশেখর চরিত্রের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চরিত্রটির নামে উপন্যাসের নামকরণ কিংবা চরিত্রটিকে নায়ক রুপে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে আপাত প্রতিবন্ধ কতা সৃষ্টি করে। বিষয়টি পরর্বতী ক্ষেত্রে আমরা পুনরায় উত্থাপন করব।

টিপ্পনী

উপন্যাসের অপর চরিত্র প্রতাপ নিসন্দেহে মানব জীবন অংশের নায়ক এবং তার জীবন পরিণতি অত্যন্ত শোকাবহ অর্থাৎ ট্র্যাজিক। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের

উপক্রমণিকা অংশ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতাপ চরিত্রের উত্থান পতনমন্ডিত ঘাত সংঘাত পূর্ণ বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবাদ প্রতিম উচ্চারণের সার্থক রুপায়ন প্রতাপ চরিত্রে পরিদৃষ্ট হবে। প্রতাপ আদর্শবান আত্মমর্যাদাস চেতন রোম্যান্টিক প্রেমিক এ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয় আবার দুঃখ বাদীও। জ্ঞাতিসম্পর্কিত শৈবলিনীর সঙ্গে তার অচরিতার্থ প্রেম ব্যর্থপ্রেমের ফলশ্রুতিতে আত্মবিসর্জনের চেষ্টা পরস্ত্রী শৈবলিনীর সঙ্গে শুদ্ধসম্পর্ক বজায় রেখে প্রাক্তন প্রেমিকার সুখ ভবিষ্যৎ কামনা ইত্যাদির মধ্যে প্রণয়ভিক্ষু প্রতাপ অপেক্ষা শুদ্ধ সত্ত্ব প্রেমিক প্রতাপই বড় হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উপন্যাসের সূচনা থেকে তৃতীয় খন্ড পর্যন্ত কাল্পনিক অংশ ঘটনার যাবতীয় ঘাত প্রতিঘাত প্রতাপ শৈবলিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শৈবলিনীর জন্যই প্রতাপের জন্মভূমি ত্যাগ শৈবলিনীর কারণেই তার ইংরেজের হাতে বন্দী দশা শৈবলিনীর উদ্যোগেই প্রতাপের বন্দীদশা মোচন এবং প্রতাপকে বিস্মৃত হওয়ার ব্রত নিয়েই শৈবলিনীর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। এই অংশে প্রতাপ শৈবলিনীর জীবনে অনুপস্থিত থাকলেও শৈবলিনীর মানসিক সংগ্রাম প্রতাপের সঙ্গেই ক্রিয়াশীল। এবং শেষত রোগমুক্ত শৈবলিনীর নতুন জীবনপর্ব সূচনার প্রাক্ কালে প্রতাপই শৈবলিনী তথা উপন্যাস পরিণাণ নির্ধারক চরিত্র হয়ে উঠেছে। প্রতাপ আত্মাহুতি দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করেছে।

সন্দেহ নেই প্রতাপ একজন মহৎ চরিত্র। কিন্তু চরিত্রটির জীবন দর্শন মানবজীবনের শাস্বত আদর্শনয়। প্রতাপ পলায়নবাদী জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির একটা পথই সে পূর্বাপর অনুসরণ করতে চেয়েছে তা হল আত্মবিসর্জন।বীর প্রেমিকের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা প্রতাপ চরিত্রে অনুপস্থিত বলেই চরিত্রটিকে সমগ্র উপন্যাসের নায়ক চরিত্ররুপে নির্বাচন করা যায় না।

উপন্যাসটির ইতিহাস অংশের নায়ক মীরকাসিম। কিন্তু চন্দ্রশেখর ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় বলেই নায়ক নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁর কথা আলোচিত হওয়া অর্থহীন। সুতরাং সে ক্ষেত্রে চন্দ্রশেখর চরিত্রটির প্রসঙ্গ পুনরায় চলে আসে।

চন্দ্রশেখর চরিত্রে নায়কোচিত সব বৈশিষ্ট্য হয়তো বর্তমান নেই কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসের যে ঘটনা বিন্যাসরীতি সেখানে মানব জীবন অংশের সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্র রচনার মাধ্যম চন্দ্রশেখর।

টিপ্পনী

দ্বিতীয়ত চরিত্রটি সত্যপরায়ণ নিষ্ঠাবান পন্ডিত ধর্মিষ্ঠ এবং চারিত্রিক মলিনতামুক্ত। তৃতীয়ত চরিত্রটি আত্ম সমালোচনা বিমুখ নয়। শৈবলিনীর প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালনের অক্ষমতাকে তিনি অকপট ভাবে স্বকার করেছেন। সেদিক থেকে চরিত্রটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

চুতর্থত উপন্যাসের প্রথম পর্বে যে চন্দ্রশেখরকে পত্নী বিমুখ উদাসীন বলে মনে হয়েছিল ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ঔদাসীন্য অমেকটাই অপসৃত হয়েছে। পঞ্চমত প্রতাপের প্রতি আসক্ত জেনেও চন্দ্রশেখর প্রতাপের প্রতি যেমন কোন রূঢ় আচরণ করেননি তেমনি শৈবলিনীকেও পাপিষ্ঠা জ্ঞান করে প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে শৈবলিনী যে ফস্টর দ্বারা কলঙ্কিতা হয়নি এই সত্যই চন্দ্রশেখরকে সর্বাপেক্ষা বেশী স্বস্তি দিয়েছে এবং শৈবলিনীর সংসার জীবনে পুনঃপ্রবেশের পথকে সুগম করেছে। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিএত তাই তন্দ্রশেখর চরিত্রটিকে আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক বলে অভিহিত করা যায় তবে একজন বলিষ্ঠ নায়ক হিসেবে নয়।

প্রতাপ চরিত্র

ইতিহাসের আধারে রচিত রোমান্স ধর্মী উপন্যাস চন্দ্রশেখর এর মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে চন্দ্রশেখর প্রতাপ ওশৈবলিনী এই তিন কাল্পনিক চরিত্রের প্রেমসমস্যার জটিল ঘটনাবর্তকে কেন্দ্র করে।

প্রতাপ চরিত্রটি চন্দ্রশেখর উপন্যাসে যেন নীতিবাদী ও আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মানস পুত্র হয়ে উঠেছে। চরিত্রটি নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র অতিমনোযোগী স্পর্শকাতর এবং অধিকাংশ সময়েই পক্ষপাতদুষ্ট। অর্থাৎ চরিত্রের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের যে বা নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব থাকা উচিত সেই দূরত্ব এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বথা রক্ষা করতে পারেননি। তাই শৈবলিনীর জীবন আখ্যান বর্ণনায় যখন ঔপন্যাসিকের লেখনী কলঙ্কিত হয়ে ওঠে তখন সেই কলঙ্কমোচনের প্রত্যাশা তিনি করেন প্রতাপের পুন্যাজীবনকাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে।

এক অর্থে প্রতাপ আলোচ্য উপন্যাসের রোম্যান্টিক প্রণয়কাহিনীর নায়ক চরিত্রও বটে। চরিত্রটি আপাতদৃষ্টিতে সরল ও আদর্শবাদী। চরিত্রটির অন্তর্মূলে লুকিয়ে আছে এক অযুম বালকেরমন। ষোল বছরের নায়ক প্রতাপ যেদিন আটবছরের বালিকা শৈবলিনীকে ভালোবেসেছিল সেদিনও তার মধ্যে ঐ বালকত্ব বর্তমান ছিল। বালকের নিস্বার্থও অকৃত্রিম ভালোবাসার জয়গান গেয়ে ঔপন্যাসিকই মন্তব্য করেছিলেন বালকের ন্যায় কেহ ভালোবাসিতে জানেনা। কিন্তু বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে ঔপন্যাসিক উক্ত এই ভবিতব্যবাণী প্রতাপও হয়তো অনুভব করেছিল যে কারণে শৈবলিনীর সামান্য তম আষানে বালকের হঠকারী চিন্তা থেকেই সে মাঝগঙ্গায় আত্ম হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। জীবনের প্রথম পর্বে এমনিকরেই প্রতাপ চরিত্রে প্রেম সম্পর্কে

একটা বা দুঃখবাদ জন্ম নিয়েছিল যার সুদূর প্রসারী প্রভাব চরিত্রটির মধ্যে উপন্যাস ঘটনায় পরিলক্ষিত হবে।

প্রতাপ দেহে ও মনে ছিল বলিষ্ঠ যুবক। বাল্য সখী শৈবলিনীর প্রতি প্রেম তাকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল আর সেই আলোড়ন নিশ্চিত ভাবে শুদ্ধ প্রেমধারণা প্রসূত । সেজন্য শৈবলিনীর সঙ্গে বিবাহ সম্ভাবনা নেই জেনেই সে আন্ত রিক ভাবে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিল। সমাজনীতিকে অস্বীকার করে শৈবলিনীকে বিবাহকরার উদগ্রতা প্রদর্শন চরিতরিটির স্বাভাবিক স্বভাববৈশিষ্ট্য ছিল না। এখানে একথাও মনে হতে পারে যে প্রতাপ এমনই একটি চরিত্র যার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক সংগ্রাম স্পৃহা বা প্রেমের জন্য চিত্ত দহন ভোগের মত মানসিক ধৈর্য বা স্থৈর্য তিলমাত্র নেই মৃত্যু কে ঝটিতি আহবান করাকেই সে মনে করে জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রধান তম উপায়।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপ পরিস্থিতির শিকার। যকনই সে শৈবলিনীর সঙ্গে স্থানিক দূরত্ব রচনা করে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে চেয়েছে এখনই পরিস্থিতির আকস্মিক টানাপোড়েনে তার জীবনে দুষ্ট সহের মত শৈবলিনী এসে উপস্থিত হয়েছে।শৈবলিনীর এইঅপ্রত্যাশিত উপস্থিতিই তার জীবনের সমস্ত হিসেব নিকেশ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। অন্যযায় প্রতাপ বিচক্ষণযুক্তি বাদী সমানীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সর্বোপরি আত্মসংযমের অগ্নি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উর্ত্তীণ। শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের কোন পাপদৃষ্টি নেই। উপন্যাস ঘটনায় দেখি শৈবলিনী যখন প্রতাপকে পাওয়ার আশাতেই তার গৃহত্যাগের কথা বলেছে তখন প্রতাপ মুহূর্ত ভাবী পরিস্থিতির এক ভয়ংকর অশনি সংকেতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়িল তিনি বৃশ্চিক দষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

কিন্তু শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপ প্রেমশূন্য এ অপবাদ কোন ক্রমেই তার উপর বর্তায় না। আসলে শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের প্রেম ফল্গু ধারার মতই অন্তর্লীন এই অন্তর্লীন তাই প্রতাপ চরিত্রেই অন্যতম বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস যে পদ্ধতিতে করেছেন তাতে চন্দ্রশেখর প্রতাপের প্রতিদ্বন্দ্বীচরিত্র না হয়ে উঠে বরং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্ চরিত্রে রুপান্তরিত হয়েছে। নীতিবাদী প্রতাপও যথাসাধ্য সেই সুহৃদের যোগ্য সাচর ও হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছে। প্রতাপ মনে রেখেছে যে চন্দ্রশেখর তার একদা প্রাণদাতা উপক্রমণিকা শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তার যাবতীয় বৈভব প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক গৌর বলা ভের প্রধান তম অনুঘটক। সুতরাং আদর্শবাদী বন্ধু প্রতাপের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না চন্দ্রশেখরেরসংসার স্থকে শৈবলিনীকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিনায়ক হয়ে ওঠা এ অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন প্রতাপের চরিত্র বিরোধী বিষয়।অন্যদিকে চন্দ্রশেখরের অনুগ্রহ প্রত্যোখ্যান করার অসৌজন্যও প্রতাপ দেখতে পারেনি এই না পারার পিছনে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা ভোগের একটা সুপ্ত বাসনাও হয়তো প্রতাপের মনে ক্রিয়াশীল ছিল। উপন্যাস ঘটনায় অবশ্য এ বিষয়টি স্পষ্টতা পায়নি।

প্রতাপের জীবনে চারটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত উপক্রমণিকা অংশে শৈবলিনীর সঙ্গে আত্মহত্যার উদ্যোগ দ্বিতীয়ত ইংরেজের বজরা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার তৃতীয়ত শৈবলিনীর অসমসাহসিকতায় ইংরেজের নৌকা থেকে শৈবলিনী কর্তৃক প্রতাপের উদ্ধার এবং চতুর্থত মানসিক বিকার থেকে আরোগ্যের পর তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর এই তীক্ষ্ণমুখ উচ্চারণ শ্রবণ।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রথম ঘটনায় আত্মহত্যার উদ্যোগ বিফলে যাওয়া এবং শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ সম্পন্ন হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বস্তত এই বিচ্ছেদ ঘটনাই প্রতাপ ও শৈবলিনী র জীবনে সুদূরপ্রশারী প্রভাব বিস্তার করেছে।

দ্বিতীয় ঘটনায় লক্ষ্য করি ইংরেজের বজরা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার করার পর ঘটনাচক্রে শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করেছে ঘটনাটি ঘটেছে প্রতাপের অজ্ঞাতে তাই নিজের বাসকক্ষে শৈবলিনীকে দর্শন করে ঘটনার আকস্মিকতায় প্রতাপ ও শৈবলিনী উভয়েই বাকৃরুদ্ধ হয়েছে। ঘটনার প্রাথমিক বিস্ময় কেটে যাওয়ার পর শৈবলিনী ক্রমন্বেয়ে তার নিজের জীবনের বিপর্যয়ের জন্য প্রতাপকেই সম্পূর্ণ দায়ী সাব্যস্ত করেছে। এই ঘটনাও প্রতাপের জীবনে এক রহস্য আলোড়ন সৃষ্টির সহায়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই দৃশ্যেই প্রতাপ ঘুমন্ত শৈবলিনী র অপরুপ রুপলাবণ্য রাশিতে মুহূর্তের জন্য বিমোহিত হয়ে পড়েছিল যদিও বঙ্কিমচন্দ্র এই বিমুগ্ধতাকে পাপচিন্তাপ্রসূত নয় বলে পাঠককে সতর্ক করেছেন।

তৃতীয় ঘটনায় ইংরেজের হাতে বন্দী প্রতাপকে শৈবলিনী কর্তৃক উদ্ধার দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে। দোসূরা চাঁদ সুলতানা শৈবলিনী এখাে যথার্থই বাঘের যোগ্য বাঘিনী হয়ে উঠে প্রতাপের মনোলোকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। গঙ্গা বক্ষে সন্তরণরত প্রতাপ এই অংশেই জীবনের পরিমাম সম্পর্কে যেমন নৈরাশ্যবাদী তেমনি মৃত্যুচেতনায় ভারক্রান্ত জীবনের এক দুর্বহভারে ভারাক্রান্ত প্রতাপ হয় মৃত্যু নতুবা শপথ গ্রহনের মাধ্যমে শৈবলিনীর প্রতাপ বিস্মরণ ঘটানোর প্রয়াসে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। আত্মবিসর্জনের একটা পটভূমিকাও এমনিভাবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রস্তত করে ফেলেছিলেন কিন্তু মৃত্যু ভীত শৈবলিনীপ্রতাপকে চিরতরে ভুলে যাওয়ার আত্মপ্রবঞ্চনাকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে যাত্রায় প্রতাপের মৃত্যু সম্ভাবনা রোধ করেছে।

প্রতাপের জীবনে চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। রমানন্দ স্বামীর আন্তরিক প্রয়াস ও স্বামী চন্দ্রশেখরের অসীম ঔদার্য তথা সহানুভূতির দ্বারা শৈবলিনী যখন স্বামী গৃহে পুনপ্রবেশের সুযোগ লাভ করেছে এবং প্রতাপও একটা মানসিক স্বস্তি লাভ করেছে সেই শান্তি পরিণামী মুহূর্তে শৈবলিনীর মুখ থেকে যে কথা গুলি জ্যামুক্ত শরের বেরিয়ে এসেছে তা নিঃসন্দেহে প্রতাপের পক্ষে প্রাণঘাতী। শৈবলিনীর সেই উক্তি ছিল এই রকম তুমি থাকেতে আমার সুখ নাই। শৈবলিনীর সুখী দাম্পত্যজীবন প্রতাপের একান্ত কাম্য ছিল। কিন্তু সে নিজেই যখন শৈবলিনীর জীবনে সুখের পথে কাঁটা তখন সেই কাঁটা উৎপাটনের দায়িত্ব প্রতাপ নিজেই গ্রহণ করেছে তাই ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও তাকে যুদ্ধ যাত্রা করতে হয়েছে ।এই যুদ্ধ তাই প্রতাপের দেশ প্রেমের পরাকাটা নয় আত্মবিসর্জনের পরিপূরকমাত্র। মৃত্যুর পূর্বে রমানন্দস্বামীকে প্রতাপ তার সেই আত্মবিসর্জনের গূঢ়র্থটি ব্যক্ত করেছে এই ভাবে কে বুঝিবে আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালোবাসিয়াছি? পাপচিত্তে আমি তাহার অনুরক্ত নহি আমার ভালোবসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্কা।

কামগন্ধহীন এই দিব্য ভালোবাসায় রমানন্দস্বামীর মত আধ্যাসিক পুরুষ পর্যন্ত অভিভূত হয়েছেন। প্রতাপ চরিত্রে তিনি আবিস্কার করেছেন অলোক সামান্য প্রেমিকের বৈশিষ্ট্য সশ্রদ্ধ উচ্চারণ করেছেন দেবতারাও তোমার তুল্য পুন্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি জন্মন্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয় জন্মী হই। প্রতাপের অন্তিমযাত্রা করুণ কিন্তু তার চারিত্রিক গৌরব প্রশংসনীয়।

মীরকাসিম চরিত্র

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁর যুদ্ধের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতাপ শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের জীবন কাল্পনিক জীবন কাহিনী নিয়ে তাঁর চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করার কোন পরিকল্পনা এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিলনা। সুতরাং ইতিহাস অংশকে গৌণ করে মানবজীবন অংশের প্রাধান্য ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে ঔপন্যাসিক এখানে অধিকতর যন্তবান হয়েছেন।

টিপ্পনী

মীরকাসেম প্রকৃত অর্থেই ঐতিহাসিক চরিত্র তিনি মীরজাফরের জামাতা এবং মীরজাফর পরবর্তী এংরেজ মনোনীত নবাব। তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬০– ১৭৬৩ খ্রীঃ। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়। মীরকাসেমের ক্ষোভ ছিল অন্যায়কারী অত্যাচারী এবং বিদেশী ধূর্ত ইংরেজের রাজ্যচালনা নীতির বিরুদ্ধে। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজকে বিতাড়িত করে স্বদেশর স্বাধীন শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্টা করতে। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সফল হয়নি। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক সত্যকে অক্ষুন্ন রেখে চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীরকাসেম চরিত্রের অবতারণা।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রথম খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসেমের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত স্বাধীন চিত্ত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রুপটিকে দলনী বেগমের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা বার্তায় ফুটিয়ে তুলেছেন যার মধ্যে সমকালীন ইতিহাসের বাস্তব বার্তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মীরকাসেম যেখানে দলনী বেগম কে বলেছেন আমি হিশ্চিত জানি এ বিবাদে ইংরেজের সঙ্গে আমি রক্ষ্য ভ্রষ্ট হইব নয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজরা যে আচরণ করিতেছে তাহাতে তাঁহারাই রাজা আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই। সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন রাজা আমরা কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপরা কেন আমি তাহা করিব এই স্বাধীন চিত্ত অহংবোধই মীরকাসেমকে আত্মমর্যদাসচেতন করে তুলেছে মীরকাসেমের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত। মীরকাসেম ঐতিহাসিক চরিত্র এবং কালের সারথি দেশ কাল ও প্রজাবর্গের অভিভাবক। সুতরাং মীরকাসিমের স্বাধীন চিত্ততা যগনায় কোচিত গৌরবের দাবী করতে পারে।

ঐতিহাসিক চরিত্র ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় দেশ কাল সমাজের উত্থান পতন ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলীর সঙ্গে বস্তুধর্মী সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে সে ব্যক্তি গত জীবনের সুখ দুঃখ কামনা বাসনা প্রেম আবেগ ধর্মিতা কোন কিছুই কোন মূল্য পায়না কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস যেহেতু আগে উপন্যাস পরে ইতিহাস তাই সেখানে ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে উপন্যাস শিল্পের জীবন তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীরকাসেম ও দলনী বেগমের উপকাহিনীর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক পুরুষ মীরকাসেমের মধ্যে সাধারণ মানবজীবনের প্রেম ভালোবাসা হিংসা অনুশোচনা ইত্যাদি সঞ্চার করে উপন্যাসের চরিত্র করে তুলেছেন। ইতিহাসে ঐতিহাসিক পুরুষের যে ব্যক্তি জীবন নেপথ্যে থেকে যায় উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শিল্পিত কল্পনা শক্তি সহায়তায় তা পুনরুদ্ধার করেন।

বলা বাহুল্য মীরকাসেমের চরিত্রে সেই মানবিক গুণের স্ফুরণ ঘটেছে দলনী বেগমের সান্নিধ্যে। দলনী নবাবের বহু বেগমের মধ্যে একজন। কিন্তু দলনীর প্রতি নবাবের হৃদয় দৌবন্য অপরিসীম।

ইতিহাসের মীরকাসেম দৃঢ় চিত্ত ইংরেজ বিরোধী কিন্তু ব্যক্তি গত জীবনে তিনি নারী প্রেম প্রত্যাশী এবং পরমপ্রেমিকও বটে। দৌলত উন্নিসাকে পরম অনুরাগবকীত তিনি ডাকেন দলনী বলে। আবার কোন নিভৃত ক্ষণে তিনি নিজের প্রেমিক সত্তাকে পূর্ণ উন্মোচিত করেন সেই দলনীর প্রতি হৃদয় অনুরাগের কথা ব্যক্ত করে আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে যেমন ভালোবাসি আমি কখনও স্ত্রীজাতিকে এরুপ ভালোবাসি নাই বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।

টিপ্পনী

ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ মীরকাসেমের জীবন বিপন্ন করতে পারে এই আশঙ্কায় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য নবাবের সেনাপতি তথা সম্পর্কে নিজের ভ্রাতা গুরগণ খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ দলনীর ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালো মেঘকে ঘনিয়ে তুলেছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী গুরুগণ খাঁ দলনীর ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য সম্পূণত দায়ী হলেও নবাব মীরকাসেমের কাছে সে সত্য অজ্ঞাতই ছিল। ফলত দলনীর দুর্গত্যাগ ইংরেজের হাতে বন্দী হওয়া এবং গুরগণ খাঁর অসহাযোগিতা তকি খাঁর মিথ্যাচার সব মিলিয়ে দলনীর প্রতি নবাবের য়ে একদা প্রেম তা এক ধ্বংসাত্মক রুপ ধারণ করল যার ফলশ্রুতিতে দলনীর অকাল মৃত্যু এই সুদূর প্রসারী প্রভাব মীরকাসেমের জীবনে প্রবল আলোড়ন তুলেছে। এই আলোড়ন এতই গভীরবিস্তারী যে মীরকাসেমের ঐতিহাসিক সত্তা এ উপন্যাসে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত হয়নি।

উপন্যাসের ষষ্ঠ খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে মীরকাসেমকে পাই সেই মীরকাসেম দলনী বেগমের প্রতি অন্যায় অবিচারকারী অনুশোচনাদগ্ধ এমনকি প্রায় শিচত্ত প্রয়াসী ব্যক্তি মীরকাসেম। সেই মীরকাসেম মহাকাল বা ইতিহাসের প্রতিনিধি ননা সেখানে ইতিহাস পুরুষের কণ্ঠ স্বর নয় একজন নারীপ্রেমী সাধারণ মানুষের আত্মবিলাপ যেন চরিত্রটিকে এক লহমায় রাষ্ট্রীয় মহিমার উচ্চ শিখর থেকে অতি সাধারণ গৌববহীন সমতলে নিক্ষিপ্ত করেছে। এই মীরকাসেম ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ে রণক্লান্ত দলনীর প্রতি অবিচারে মর্মাহত এবং নবাব সত্তাবিস্মৃত এক নিসম্বল অভাজন। তাঁর কণ্ঠে তাই শুনি তাঁর চরিত্রেবিরোধী সংলাপ তোমরা পারো সুবা রক্ষা কর আমি চলিল। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব। আর তাঁর অন্তিম ইচ্ছা সেই দলনীরকারের কাছে আমার কবর দিও। কালের সারথির এই দীন ইচ্ছা আমাদের হতাশ করে।

দলনী

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব মীরকাসেমের সুন্দরী বেগম দলনী বিবি। দলনী রুপসী। তার রুপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যুবতী সপ্তম দশ বর্ষায়া কিন্তু খর্বাকৃতা বালিকার ন্যায় সুকুমার। তার নির্দোষ গঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজর্থ রাশি তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশ ভার স্বর্ণরচিত সুগন্ধ বিকীর্ণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় তাহার অঙ্গ সঞ্চালন মাত্র গৃহমধ্যে যেন রুপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্যমাত্রে তরঙ্গ উঠে তেমনি তরঙ্গ উঠিল।

দলনী শুধু সুন্দরী নয় রুচিশীল। সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদিতে পারদর্শিনী। শৈবলিনী বিদুষী গুলেস্তাঁ পাঠিকা। নবাবের প্রতি তার প্রেম এক নিষ্ঠ তাই নবাবের সামান্য অমনোযোগ তাকে অভিমানিনী করে তোলে। দলনী নবাবের পরম হিতা কাঙ্কিনীও। ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ আসন্ন জেনে স্বামীর জীবন ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিষয়ে উতলা হয়ে পড়ে। মীরকাসেমকে সে যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার পরামর্শ দেয় কিন্তু পৌরুষাভিমানী মীরকাসেম স্ত্রীলোকের পরামর্শে

কর্ণপাত করেন না। তখন শেষ প্রয়াস হিসেবে দলনী নবাবের প্রধান সেনাপতি তথা সম্পর্কে নিজের ভ্রাতা গুরগণের কারণাপন্ন হয় যাতে গুরগণ নবাবকে যুদ্ধ যাত্রা থেকে নিস্ত করে। কিন্তু গুরগণ যে নবাবকে সিংহাসন চ্যুত করে। নিজেই নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত হতে চায় এই সত্য জানাজানি হয়ে যাওয়ার গুরগণ খাঁর নিদেশে দলনীর নবাবের দুর্গে প্রবেশের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপরই দলনীর জীবনে দুর্ভাগ্যের চরম অভিঘাত নেমে আসে। দলনীর প্রতি নবাবের বিরুপতা তকি খাঁর প্রতারণা তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার দলনীর মৃত্যু দন্ডাজ্ঞা গিয়ে নবাবের পরোয়ানা প্রেণ শৈবলিনীকে পাওয়ার জন্য তকি খাঁর প্রস্তাব ও শৈবলিনী কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং শেষত নবাবের প্রতি চরম অভিমানে স্বেচ্ছায় বিষপান করে আত্মহত্যা দলনীর জীবনে ক্রমান্বয়ে এই ঘটনাগুলি প্রার নাটকীয় ক্ষিপ্রতায় সংঘটিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কুলসমের প্রদত্ত বিবরণে যখন নবাবের দলনী সম্পর্কে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হয়েছে তখন নবাব এক অসহায় শ্রোতা মাত্র।

টিপ্পনী

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দলনী এক ট্র্যাজিক চরিত্র তার জীবনের ট্র্যাকিডি বহিঘটনার অপ্রতিরোধ্য অভিঘাতে কিংবা বলা যায় নিয়তির অনিবার্য অঙ্গুলিহেলনে। শেক্সপীয়র সমালোচক যেমন শেক্স্পীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন দলনী সেই অর্থে নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা হেয় ওঠেনি কতকগুলি প্রতিকূল ঘটনাই তাকে জীবন যুদ্ধে পরাস্ত করেছে।

চরিত্র বিচারে দলনী এবং শৈবলিনী পরস্পর পরস্পরের বিপ্রতীপ। শৈবলিনী স্বামীর সংসার থেকে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে অন্য কারও খোঁজে বহিমুখী কিন্তু দলনী স্বামী ও সংসারকে সবলে আঁকড়ে ধরতে চেয়েও বিরুদ্ধ শক্তির তাড়নায় স্বামী বিচ্ছিন্ন তবে চাত্রিত্রিক গভীরতা ও সমস্যা জটিলতার দিক থেকে এই উপন্যাসে শৈবলিনীর সঞ্চরণ ক্ষেত্র দলনী অপেক্ষা ব্যাপকতর। তবে দলনী এই উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেটি এখানে উল্লেখযোগ্য দলনীর কারণেই নবাব মীরকাসেম চন্দ্রশেখরকে মুর্শিদাবাদে তলব করেছিলেন সুতরাং চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ইতিহাস অংশের সঙ্গে মানবজীবন অংশের সম্পর্ক সূত্র স্থাপনে দলনীর ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য দ্বিতীয়ত গৃহে চনদ্রশেখরের অনুপস্থিতির কারণেই লরেন্স ফস্টর কর্তৃক শৈবলিনীর অপহরণ এত সহজতর হয়েছিল। বস্তত পক্ষে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জীবন বির্যয়ের পিছনেও দলনী চরিত্রের পরোক্ষ দায়িত্ব থেকেই যায়।

রমানন্দ স্বামী

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের তৃতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা সর্বপ্রথম রমানন্দ স্বামী নামে এক পরমহংসের সাক্ষাৎ পাই। পরমহংস তিনিই যিনি শুদ্ধচিত্ত সংযতাত্না নির্বিকার ব্রক্ষানন্দে মগ্ন যোগিপুরুষ। তিনি পুন্যাত্মা স্বভাবতই পরিচ্ছেদটির নামকরণ হয়েছে পুণ্যের স্পর্ণ নামে। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ ও ভারত বর্ষের লুপ্ত জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন বিশেষ জ্ঞরুপে উল্লেখ করেছেন।

এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রমানন্দ স্বামীর প্রাক্ আগমন পর্বে চন্দ্রশেখরকে জ্ঞানী পন্ডিত ধমিষ্ঠ ও দেবদুলভ চরিত্র রুপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু শৈবলিনীর অপহরণ পরবর্তী ঘটনায়

মান সিক ভাবে বিপর্যস্ত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় চন্দ্রশেখর যখন আজন্ম অর্জিত জ্ঞান শক্তি সহায়তায় মানসিক স্থিতি লাভ করতে পারেননি তখন অনন্যে পায় বঙ্কিমচন্দ্রকে চন্দ্রশেখরতর অন্য এক চরিত্রের অনুসন্ধান করতে হয়েছে। যিনি হবেন সাধনা তপস্যা ব্যক্তিত্ব প্রাজ্ঞতা শাস্ত্রজ্ঞান ও বিবেচনা শক্তিতে চন্দ্রশেখর অপেক্ষা উচ্চবর্তী।

ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব জীব জগৎ ঈশ্বর সম্পর্কিত দার্শনিক বোধ আদর্শজীবনের লক্ষ্য নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে চিরকাল একটা কৌতূহল ছিল। ধর্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা ইত্যাদি রচনায় সে বিষয়ে তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য বারবার প্রতি ফলিতও হয়েছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে রমানন্দ স্বামীর অবতারণা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই রকম মানসিকতারই প্রতিফলন বলে আমাদের মনে হতে পারে।

টিপ্পনী

পরিস্থিতির চাপে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত চন্দ্রশেখরের একটা মানসিক আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল রমানন্দ স্বামী সেই মানসিক আশ্রয়দাতা জীবনে সুখ দুঃখের স্বরুপ ও গুরুত্ব জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে যথোপযুক্ত আলোচনা করে ভগ্নমন চন্দ্রশেখরকে তিনি জীবনের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে চলার উপদেশ দিয়েছেন চন্দ্রশেখরও সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে গুরু বলে বরণ করে নিয়েছেন।

উপন্যাসের ঘটনাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রমানন্দ স্বামী শুধু তাত্ত্বিক চরিত্র রুপে নয় প্রয়োজনে তিনি মূল উপন্যাস ঘটনার অন্যতম শরিক চরিত্রও হয়ে উঠেছেন। চন্দ্রশেখর শৈবলিনী এমনকি দলনীর হিতাকাঙ্কায় তিনি প্রায়শই উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং প্রাজ্ঞজনের মতই কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বৈরাগ্য যাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য পরিচয়ে যিনি সন্ন্যাসী সেই রমানন্দ স্বামী ঘটনাপ্রভাবে যে ভাবে সমাজ সংসারের মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়ছিলেন তাতে তাঁর মনে একটা দ্বিধাও ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছিল। উপন্যাসের ষষ্ঠ খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সেই দ্বিধান্বিত ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এই ভাবে বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।

প্রতাপ সম্পর্কের রমানন্দ স্বামীর উচ্চ ধারণা ছিল সর্বোপরি চিল গভীর সহানুভূতিবোধ। সেই সহানুভূতি থেকেই তিনি চন্দ্রশেখরকে বলেছিলেন, প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী তোমার জন্যই এ দুর্দশাগ্রস্ত তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারিবেনা। ষষ্ঠ খন্ড প্রথম পরিচ্ছেদ। বস্তত পক্ষে রমানন্দ স্বামী নরনারীর পার্থিব প্রেমসম্পর্কেও যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান।তাই শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের অনাসক্ত দিব্য প্রেমকে তিনি নির্দ্বিধায় শুধু স্বীকৃতিই দেননি প্রতাপের পেম গভীরতায় মুগ্ধ অশ্রুসজল রমানন্দ স্বামী মন্তব্য করেছেন এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরিহিত ব্রতধারী। আমরা ভন্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই। তিনি মুমূর্ষু প্রতাপকে আরও বলেছেন যদি চিত্ত সংযমে পুন্য থাকে তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুর্ণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি জন্মন্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।

মানবিক প্রেমের প্রতি রমানন্দ স্বামীর এই সশ্রদ্ধ মনোভাব এটাই প্রমান করে যে চন্দ্রশেখর উপন্যাসে রমানন্দ স্বামী নিছক একজন শুষ্ক তত্তববেত্তা নন, তাঁর মধ্যেও আছে সামাজিক মানুষের স্পর্শকাতর অনুভূতি

‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র চিত্রনেও বঙ্কিমচন্দ্র মোটেই অমনোযোগী নন। ঘটনার তাগিদেই উপন্যাসে চরিত্রসন্নিবিষ্ট হয়, অপ্রধান চরিত্রও তার ব্যতিক্রম নয় বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্যে বিশ্বাসী চিলেন। ফলত স্বল্পক্ষেত্রে বিচরণ করেও চন্দ্রশেখর উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রগুলি অধিকাংশ সময়েই উপন্যাস ঘটনায় নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেছে।

এই উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুন্দরী রামচরণ কুলসম গুরগণ খাঁ, তকি খাঁ, সমরু আমীর হোসেন ইরফান আমিয়ট গলস্টন লরেন্স ফস্টর প্রমুখ।

টিপ্পনী

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে সুন্দরী একজন সাধারণ নারীচরিত্র। সে সরলমনা রসিকা এবং পতিব্রতা রমণী। সে শৈবলিনীর সাথী এবং সম্পর্কে প্রতাপের শ্যালিকা। উপন্যাস ঘটনায় অন্তত দুটি ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ প্রথমত লরেন্স ফস্টর কর্তৃক শৈবলিনীর অপহরণের পর সুন্দরী তার স্বামীর সহায়তায় শৈবলিনীকে উদ্ধার করার জন্য ইংরেজের বজরায় অন্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রবেশ করেছিল যদিও শৈবলিনী সেযাএায় সুন্দরীকে নিরস্ত করেছিল দ্বিতীয়ত সুন্দরীর মাধ্যমেই প্রতাপ শৈবলিনীর গৃহত্যাগের সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং শৈবলিনীকে উদ্ধার করার জন্য প্রতাপ নিজে উদ্যোগী হয়েছিল। প্রতাপের এই উদ্যোগের ফলশ্রুতির রুপেই উপন্যাসে ঘটনায় নতুন জটিলতা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। উপন্যাসের শেষংশে যেখানে শৈবলিনীর উত্থাদদশা সেখানে সুন্দরীকে আমরা এক সহমর্মিনী ও বন্ধুবৎসলা রমনীরুপে প্রত্যক্ষকরি।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে রামচরণ একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য চরিত্র। প্রতাপ তার মণিব। সে সাহসী অনুগত এবং বন্দুক চালনায় দক্ষ। তার অব্যর্থ নিশনায় লরেন্স ফস্টর গুলিবিদ্ধ হয়। অপহৃত শৈবলিনীর উদ্ধারের পর রামচরণই তাকে নিজের সিদ্ধান্ত মতে প্রতাপের গৃহে নিয়ে আসে। এই ঘটনা প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনে এক নাটকীয় মোড় নিয়ে আসতে সহায়তা করেছে । প্রতাপের গৃহে ইংরেজের গুলিতে আহত হওয়ার পর তার বন্দীজীবনের সূত্রপাত অর্থাৎ প্রতাপ শৈবলিনীর জীবন দ্বন্দ্বের অভিযাতও তার জীবনকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া উপন্যাসের গুরুগমভীর পরিবেশে রামচরণের রঙ্গ রসিকতা মাঝে মাঝেই পাঠকবিত্তে একটা প্রসন্ন হাস্যরসও সঞ্চার করেছে।

ব্যক্তিপরিচয়ে কুলসম দলনী বেগমের পরিচারিকা। কুলসম বুদ্ধিমতী সাহসিনী কর্মদক্ষ। পরিচারিকা হলেও সে ব্যক্তিত্বময়ী নয়। দলনী বেগমের সুখের দিনেরই সে সহচরী নয় দলনী বেগমের চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের দিনেও সে বেগমসাহেবার শুভাকাঙ্কিনীর ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে।

দলনী বেগমের সঙ্গে কুলসমের বিচ্ছিন্নতা সংঘটন ও পরিণামে তকি খাঁর প্রতারণায় দলনীর করুণ মৃত্যু বরণ কুলসমকে আত্মসমালোচনা পরায়ণ করে তুলেছে। এই আত্ম সমালোচনা চরিত্রটির সততার পরিচায়ক। কুলসমের প্রয়াসেই দলনী সম্পর্কে নবাবের ভ্রান্তধারণা প্রাথমিক ভাবে বিদূরিত হয়েছে। শুধু তাই নয় দলনীর প্রতি নবাবের অবিচারকে কুলসম নবাবের মহামূর্খামি বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছে। চরিত্রটির এই সাহসী ভূমিকা মুহূর্তের জন্য হলেও কুলসমকে পরিচারিকাবৃত্তির ক্ষুদ্র গন্ডী থেকে যেন অনেক ঊর্ধ্ববতী করে তুলেছে।

সুদূর ইস্পাহান থেকে আগত জাতিতে আরমানি গুরগণ খাঁ সামান্য বস্ত্রবিক্রেতা থেকে

টিপ্পনী

আপন প্রতিভাবলে নবাব মীরকাসিমের প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্পর্কে সে দলনীর ভ্রাতা। ইতিহাস অংশের কাহিনীতে গুরগণ খাঁর ভূমিকা নিছক গৌণ বলে বিবেচিত হবেনা। স্বয়ং নবাব ছিলেন গুরগণ খাঁর উপর একান্ত নির্ভরশীল। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হলে নবাব সেই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সামান্য তম স্বপ্ন দেখলেও তার ভিত্তি ছিল গুরগণ খাঁর যুদ্ধনৈপুণ্য। গুরগণ খাঁর উদ্যোগেই নবাবের সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ সেনার প্রবর্তন ইউরোপীয় যুদ্ধরীতিতে সেনাবাহিকে প্রশিক্ষিত করা উন্নত মানের বন্দুক নির্মাণ ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধ কৌশলগুলি গৃহীত হয়েছিল।

কিন্তু গুরগণ খাঁ মোটেই নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপিত ছিলনা। সে ছিল অতি উচ্চাকাঙ্খী। নবাবকে মসনদচ্যুত করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হয়ে ওঠাই ছিল তার প্রধান তম লক্ষ্য। এজন্য কৌশলে সে ইংরেজের সাহায্যও যেমন নিতে চেয়েছিল তেমনি সুযোগমত ইংরেজকেও সে এদেশ থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিল।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দলনীর ভাগ্য বিরর্যয় তথা শোচনীয় পরিণতির জন্য মূলত দায়ী চরিত্র হল গুরগণ খাঁ। নিজ ভগ্নীর প্রতি তার ঘৃণ্য আচরণ চরিত্রটিকে প্রায় খল চরিত্রের পর্যায়ে অবনমিত করেছে।

আলোচ্য উপন্যাসে তকি খাঁ অপর একজন স্বার্থান্বেষী প্রতারক ও কামনালুব্ধ চরিত্র। নবাবের বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তিরুপে পরিচায়িত হলেও নবাবের প্রতি তার মিথ্যাচরণ ও নবাব পত্নীকে হস্তগত করার হীন চক্রান্ত শেষ পর্যন্ত দলনীর অকালমৃত্যু ও নবাবের করুণ জীবন পরিণামের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। অবশ্য পরিণামে এই দুষ্টচরিত্রটি যথাযোগ্য শাস্তি লাভ করেছে।

অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে সমরু আমীর হোসেন ইরফান খুব একটা উল্লেখযোগ্য চরিত্র নয়। বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্র গুলির আর্বিভাব ঘটেছে। এবং বিশেষ উদ্দেশ্য টি সাধিত হলে উপন্যাস অংশ থেকে চরিত্র গুলির নিষ্ক্রমণ ঘটেছে।

ইংরেজ চরিত্রগুলির মধ্যে লরেন্স ফস্টর চরিত্রটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বস্তুতপক্ষে লরেন্স ফস্টরের কামনা বহ্নিতেই শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহদাহের সূচনা হয়েছে। বলে ধরে নেওয়া যায়।

স্বদেশে প্রেমিকা প্রত্যাখ্যাতা ফস্টর ভারতবর্ষে এসে শৈবলিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং শৈবলিনীকে হস্তগত করার জন্য হীন কৌশল অবলম্বন করে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ফস্টর কর্তৃক শৈবলিনীর অপহরণ ঘটনাই উপন্যাস অংশে যাবতীয় সমস্যা ও দ্বন্ধ দ্বংঘাতের মূল উৎস।

নানান ঘটনা দুর্ঘটনায় ফস্টরের জীবন পরিপূর্ণ। তারকামনা বা স্বপ্ন চরিতার্থ হয়নি, উপরন্ত তার জীবনের একটা বিরাট অংশে অতিবাহিত হয়েছে প্রায় অর্থবের মত নিষ্ক্রিয়তায় ও পরনির্ভরতায় উপন্যাস অংশে শৈবলিনীকে শুদ্ধ চরিত্ররুপে স্বীকৃতি দিয়ে ফস্টর শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের মানসিক দ্বন্ধ নিরসনে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সেদিক থেকে চন্দ্রশেখর উপন্যাসে সমস্যার সূচক ও সমস্যার সমাধানকারী চরিত্ররুপে লরেন্স ফস্টরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

আমিয়ট গলস্টন প্রমুখ ইংরেজ চরিত্র গুলিও উপন্যাস ঘটনায় যে যার নিজের দায়িত্ব

যথাযথ ভাবে পালন করেছে।

সুতরাং বলা যায় গৌণ চরিত্রের অবতার ণায় চন্দ্রশেখর উপন্যাসে যথার্থ ঔপন্যাসিকের দায়িত্বই পালন করেছেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত উপাদান

টিপ্পনী

কার্যকারণ সম্পর্ক রহিত বা যুক্তি বিচারের ঊর্ধ্ববতী অথবা বাস্তব জগৎ পরিবেশে অবিশ্বাস্যযোগ্য ঘটনাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলে অভিহিত করি। আবার একথাও সত্যি জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধ তাহেতু আজ যাকে অতিপ্রাকৃত বলে মনে হচ্ছে পরবতীকালে হয়তো তার রহস্যভেদ হওয়ার ফলে একদা অতিপ্রাকৃত বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি লাভ করবে। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন কপাল কুন্ডলায় অতিপ্রাকৃত ঘটনা মূল উপন্যাস ঘটনারই নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে। লোকায়ত সংস্কার বিশেষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভঙ্গী লোকপরম্পরা বা বংশপরম্পারাগত বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় অনেক সময় অতিপ্রাকৃত ঘটনা বা এই সম্পর্কিত ধারণার জন্ম দিয়ে থাকে।

রোমন্স রস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রেরঅন্যতম প্রিয় বিষয়। রোমন্স রস সৃষ্টি করতেগিয়েই তিনি একাধিক উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত শ্রেণী র ঘটনার বশাবর্তী হয়েছেন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত ঘটনা সন্নিবেশে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ শাস্ত্র স্বপ্ন দর্শন এবং যোগবল মূলত এই তিন শ্রেণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রনয় বলে যুক্তি বাদী গণ মত প্রকাশ করেন।চন্দ্রশেখরউপন্যাসের প্রথম ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ এসেছে এবং বেদগ্রাম নিবাসী চন্দ্রশেখর একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষী বলে নবাব মতপ্রকাশ করেছেন। প্রথম খন্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে জ্যোতিষিক গননায় চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ নির্নয়ে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে রাজকমচারীকে বলেছেন সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত। সুতরাং জ্যোতিষ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কোন অতিপ্রাকৃত ধারণা পোষণ করেননি। যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন জ্যোতিষী গননাকে সত্যমূল্য প্রদান করলে চন্দ্রশেখরের ভাগ্য বিড়ম্বনাকে উপন্যাস ঘটনায় এতখানি নাটকীয় রীতিতে উপস্থাপন করা যেত না কিংবা জ্যোতিষী হয়েও নিজেও দুভাগ্য সম্পর্কেচন্দ্রশেখরের অজ্ঞতা পাঠকমনে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাব জাগিয়ে তুলত।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে স্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গ টি বেশ কয়েকবার উত্থাপিত হয়েছে। তবে প্রথম দুটি ক্ষেত্রেস্বপ্নদর্শন মানবমনের স্বাভাবিক ক্রিয়ারুপেই প্রতিফলিত হয়েছে আর অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে স্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গ এসেছে দুর্বল শরীর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং নানান প্রতিকূল মানসিক ঘাতসংঘাত ইত্যাদির ফলশ্রুতিস্বরুপ চরিত্রের মানসিক বিকারগ্রস্ততা থেকে।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে স্বপ্নদর্শন প্রসঙ্গ আছে যথাক্রমে দ্বিতীয় খন্ড ষষ্ঠ এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে চতুর্থ খন্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে। এছাড়াও ঐ খন্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদেও শৈবলিনীর নরকভয়জনিত অনুভূতির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

চতুর্থ খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অপহৃতচেতনা অর্ধনিদ্রাভিভূত অর্ধজাগ্রতবস্থার পর

শৈবলিনীর চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হলে সে ভয়ংকর রুধির স্রোতসংবলিত গলিত মৃত দেহ পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় নরকদৃশ্য দর্শন করেছে। সেই নরক বীভৎস অসহনীয় মর্মপীড়াদায়ক ভীতিপগদ এবং মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও ধিকতর যন্ত্রণদায়ী। তৃতীয় পরিচ্ছেদে একাধিকবারস্বপ্ন দখর্শন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে।এবন প্রত্যেককবারই শৈবলিন হয় লুপ্ত চেতনা না হয় শৈবলিনী ভেবেছে মৃত্যু হইয়াছে জ্ঞান আছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর অতিপ্রাকৃতসম্পর্কিত ধারণাকে চন্দ্রশেখর বায়ুরোগ এর ফলশ্রুতি বলে মত প্রকাশ করেছেন।

টিপ্পনী

সুতরাং এ সমস্ত ক্ষেত্রে শৈবলিনীর স্বপ্ন দর্শন ও অতিপ্রাকৃত চিন্তা চরিত্রটিরই মানসিক সমস্যাজাত ব্যাথার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্রয়জাত নয়।

ষষ্ঠ খন্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম যোগনাম যোগবল না। এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের দ্বারাই বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস যোগবল এর গুরুত্ব লঘু করেদিয়েছেন।শৈবলিনীর পূর্ব আরোগ্যের জন্য রমানন্দ স্বামী কমন্ডলুস্থিত যে পুন্যবারি চন্দ্রশেখরকে প্রদান করেছিলেন সেই পুন্যবারির কোন অলৌকিক মাহাত্ম্য বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রচার করেননি। এ ব্যাপারে রমানন্দ স্বামীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায় ঔষধ আর কিছু নহে কমন্ডলুস্থিত জলমাত্র। তাই বলা যায় শৈবলিনীর আরোগ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব নয় মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎ সাই শৈবলিনীর রোগমুক্তির প্রধানতম কারণ।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১) ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে চন্দ্রশেখর বিচার্য কিনা আলোচনা করুন।

২) অনেকের মতে চন্দ্রশেখর রোমান্সধর্মী উপন্যাস - মতটি কতদূর গ্রহণযোগ্য আলোচনা করুন।

৩) ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত 'চন্দ্রশেখর' একটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস - বিষয়টি পর্যালোচনা করুন।

৪) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কে? - আলোচনা করুন।

৫) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপ চরিত্রটি আদর্শ প্রেমিক চরিত্র - এই মত আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা বিশ্লেষণ করুন।

৬) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে নাম-চরিত্রটির উপন্যাসগত ভূমিকা নির্দেশ করুন।

৭) শুধু বঙ্কিমসাহিত্যে নয়, সমস্ত বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে শৈবলিনী একটি অন্যতম জটিল নারীচরিত্র - চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে তার জটিলতাগুলি নির্ণয় করুন।

৮) এক অর্থে শৈবলিনী 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মানব-জীবন অংশের নায়িকাচরিত্র - তার চরিত্রে নায়িকাসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি আলোকপাত করুন।

৯) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের অনৈতিকহাসিক অংশের অন্যতম প্রধান চরিত্র শৈবলিনী উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকে কতখানি প্রভাবিত করেছে ব্যাখ্যা করুন।

১০) প্রতাপচরিত্রের পরিণতি কতখানি শিল্পসম্মত হয়েছে নির্দেশ করুন।

১১) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে অতিপ্রাকৃত ঘটনা উপন্যাসের বাস্তবতাকে ক্ষুন্ন করেছে কিনা আলোচনা করুন।

১২) রমানন্দ স্বামী চরিত্রটির উপন্যাসগত উপযোগিতা বিচার করুন।

১৩) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের ঐতিহাসিক কাহিনীর নায়ক মীরকাসেম - উপন্যাস ঘটনায় চরিত্রটির ঐতিহাসিকত্ব ও নায়কত্ব কতখানি রক্ষিত হয়েছে আলোচনা করুন।

১৪) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিতা এক ট্র্যাজিক নারীচরিত্র দলনী - আপনি মন্তব্যটির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন কিনা ব্যাখ্যা করুন।

টিপ্পনী

১৫) শৈবলিনীর জীবনের যে বিপর্যয় তার জন্য চরিত্রটি নিজে কম দায়ী নয় - উপন্যাস ঘটনা আলোচনা করে বিষয়টি পরিস্ফুট করুন।

১৬) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাস ও মানবজীবন অংশ ঔপন্যাসিকের কাহিনীগ্রন্থন কৌশলে কেমন করে একটি অখন্ড উপন্যাসবৃত্তে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্লেষণ করুন।

১৭) 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের পরিণতি শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা বিচার করুন।

১৮) প্রতাপের মৃত্যু চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর দাম্পত্যজীবনকে নিষ্কন্টক করেছে কিনা বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১) 'বাল্যকালের ভালোবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।' কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটির লেখককৃত ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করুন।

২) কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? - বক্তা কে? কোন্ পরিস্থিতিতে এই আত্মজিজ্ঞাসা? উদ্ধৃতিটি থেকে বক্তা-চরিত্র সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হয়?

৩) ইংরেজরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? - বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটি অবলম্বনে বক্তাচরিত্রের মূলভাবটি বিশ্লেষণ করুন।

৪) 'আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ - সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল।' - কে বলেছেন? কখন বলেছেন? বক্তার এই ভাবনার যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৫) "কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু, -"
কে, কাকে, কখন একথা বলেছে? কোন্ কষ্টের কথা বলা হয়েছে? বক্তার মানসিকভাবের পরিচয় দিন।

৬) 'আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি।' - কার উক্তি? এই রূপ ভাবার কারণ কি? বক্তার মানসিক পরিস্থিতিটি বিশ্লেষণ করুন।

৭) 'আমার ভরসা আছে, তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে।' - কে, কাকে

একথা বলেছেন? নুরজাহান কে? দ্বিতীয় নুরজাহান হওয়া বিষয়ে বক্তা কি বলতে চেয়েছেন?

৮) 'শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবত্ত আমাকে ভয় করেন।'
প্রতাপ রায় কে? সে কাকে বা কাদের একথা বলেছিল? প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বক্তা চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

৯) 'কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফস্টরের মুখের মত।' – প্রসঙ্গসহ উদ্ধৃতিটির নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করুন।

টিপ্পনী

১০) 'তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল?'– বক্তা কে? কোন্ পরিস্থিতিতে এই উক্তি উল্লেখ করে চরিত্রটির অন্তর্জগতের পরিচয় প্রদান করুন।

১১) 'সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ – সে আমার মৃত্যু।'
'সে' কে? তার সম্পর্কে বক্তার এই ধারণার তাৎপর্যার্থ বিশ্লেষণ করুন।

১২) 'মরিব? না – আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব।'
কে একথা ভেবেছে? 'আজ' বলতে কোন্ সময়কে নির্দেশ করা হয়েছে। তার বেদগ্রামে মৃত্যুবরণের সিদ্ধান্ত কেন? 'মৃত্যু' সম্পর্কে চরিত্রটির মনোভাব কি?

১৩) 'মনে মনে কহিল যে, এদোসরা চাঁদসুলতানা।' – কে, কখন মনে মনে একথা বলেছে। চাঁদসুলতানা কে? এদোসরা চাঁদসুলতানা ভাবার কারণ কি?

১৪) 'তোমার শপথ – তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।' – কে, কার কাছে শপথ করেছে। শপথের পরিণামটি কি?

১৫) 'ভিক্টর হুগো যে সমুদ্রতলবাসী রাক্ষসস্বভাব পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্খাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়।'
ভিক্টর হ্যুগো কে? তাঁর বর্ণিত পুরুভূজের বর্ণনাটি কেমন? এখানে প্রসঙ্গটি অবতারণার কারণ কি?

১৬) 'মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই – কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে, ...'
কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি করা হয়েছে? শৈবলিনী সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য কেন করা হয়েছে?

১৭) 'রক্ষা কর! এ নরক! এখানে হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?'
এই আকুতি কার? কোন্ পরিস্থিতিতে এই আকুতি? উপন্যাসে বর্ণিত নরকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

১৮) 'ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা!'
এই অনুভূতি কার? পরিস্থিতিটির বর্ণনা দাও।

১৯) 'সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্বক ফস্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম।'
কে কাকে একথা বলেছে? কোন্ মিথ্যার কথা বলা হয়েছে? ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

দিন।

২০) ‘শুনুন, সুবে বাঙ্গালা বেহারের মীরকাসেম নামে এক মূর্খ নবাব আছে।’
কে, কাদের উদ্দেশ্য করে একথা বলেছে? বক্তা মীরকাসেমকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছে কেন? নবাবের মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

২১) ‘এক্ষণে জানিলাম ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব?’
বক্তা কে? তিনি কাকে নিষ্পাপ বলে জেনেছেন? প্রসঙ্গটি সবিস্তারে উল্লেখ করুন।

২২) ‘আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।’
কে, কাকে বলেছে? কখন বলেছে? এই উক্তির পিছনে বক্তা-চরিত্রের কোন্ মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে?

২৩) ‘আমার ভালোবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্খা।’
কে, কাকে একথা বলেছে? প্রসঙ্গ কি? বক্তার এই উল্লেখের সত্যতা বিচার করুন।

২৪) ‘যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন।’
এই উক্তি কার? কাকে উপলক্ষ্য করে একথা বলা হয়েছে? উপন্যাস-ঘটনায় বক্তার এই উক্তির যথার্থ লক্ষিত হয় কিনা সংক্ষেপে বলুন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক

পদ্মা নদীর মাঝি-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য ও শিল্পীমানস

টিপ্পনী

'বিচিত্রা' পত্রিকায় নিজের লেখা প্রকাশ করবেন-বন্ধুদের সঙ্গে এই বাজি ধরে প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিচিত্রা অফিসে একটি লেখা জমা দিয়েছিলেন। ''গল্পটির নাম 'অতসামামী'। লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। .....লেখাটা অদ্ভুত লাগল। গল্প ছাপা হল 'বিচিত্রায়'। একটি লেখাকেই মাণিকের আর্বিভাব অভ্যর্থিত হল।'-আত্মনাম প্রকাশে সঙ্কুচিত প্রবোধকুমার তাঁর ডারনামেই প্রথম লেখা প্রকাশ করলেন, তারপর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই হল তাঁর লেখক পরিচয়।

বিজ্ঞানের ছাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আপাদমস্তক ছিলেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী। এই বিজ্ঞানমনস্কতাই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে বাস্তববাদী করে তুলেছিল। অঙ্কে অনার্স নিয়ে ১৯২৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন।এই সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন '' অঙ্কের মত এমন আর কি আছে? এত জটিলতার এমন চুলচেরা নিয়ম।রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ত অভিনব কাব্য-ছ্যাবলামি, ন্যাকামি, হাল্কা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই।'' বোঝা যায়, জীবনের সূচনাপর্ব থেকেই আবেগ, ভাবোচ্ছাস, অতিশয়োক্তি এবং লঘুচিন্তাভাবনার প্রতি তিনি বিতৃষ্ণ ছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টির নেশায় মশগুল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু শেষপর্যন্ত বি.এস.সি. পাশ করতে পারেননি। পরে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পর্বে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেশী-বিদেশী বহুগ্রন্থ পাঠ করেন-ম্যাক্সিম গোষ্ঠী তাঁকে সর্বাপেক্ষা আলোড়িত করে। শুধু সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যপাঠ নয়, একই সঙ্গে তিনি ফ্রয়েড, এলিস প্রমুখ দিক্‌পাল পন্ডিত-গবেষকদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণাগ্রন্থ ও মানববিজ্ঞান পাঠ করেছিলেন। বিজ্ঞানমূলক চিন্তার সাহায্যে এই যে জগৎ ও মানজীবনকে জানার অদম্য কৌতুহল, সেটাই তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান।অনেকগুলি ভাইবোন তাঁর।এদের মধ্যে সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কৃতী বৈজ্ঞানিক।পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল অসীম শ্রদ্ধা। ১৯৫২ সালে পিতাকে লেখা একটি পত্রের কিছুটা অংশ এ ব্যাপারে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে-'' পিতা হিসাবে আপনি শুধু আমার নমস্য নয়, লাখ লাখ লোকের নমস্য হয়ে রইলেন।বিক্রমপুরের গাঁয়ের একটি ছেলে কোনমতে বি.এ. পাশ করে যে সুধাংশু আর মাণিককে সৃষ্টি করতে পারে-একই বংশে বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে পারে, এ গৌরব বাংলার একমাত্র আপনি পেয়েছেন।'' তবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী সম্পর্কে আশ্চর্যরকমের নীরবতা পালন করেছেন।

মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও মধ্যবিত্ত মানুষের গতানুগতিক ঠুনকো ভাবাবেগ এবং অন্ত:সারশূন্য আদর্শবোধ দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি।উপরন্তু বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই শ্রেণীর মানুষদের বিচার করতে গিয়ে তিনি তাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন অজস্র সংকীর্ণতা,

স্বার্থপরতা, মুখোশ-পরা ভালোমানুষীর ভন্ডামি এবং কাপুরুষেরা। এই নেতিবাচক দিকগুলি মধ্যবিত্ত জীবনসম্পর্কে তাঁর মনকে বিরূপ করে তুলেছিল। আবার বাল্যকাল থেকেই তাঁর অবাধ মোলামেশা ছিল সমাজের নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ মানুষদের সঙ্গে-মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বাগদী-চাষী-মজুরেরা ছিল তাঁর কাছে অনেক বেশী বাস্তব ও স্পষ্ট জগতের বাসিন্দা। ফলত: এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষদের প্রতি অতি অল্পবয়স থেকেই তাঁর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জেগেছিল। পরবর্তীকালে দীক্ষা গ্রহণের পর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র মানবজীবন সম্পর্কে আরও বৃহত্তর উপলব্ধির শরীক হয়েছিলেন।

টিপ্পনী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ 'কল্লোলের' অব্যবহিত পরবর্তী যুগ। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক বলে উল্লেখ করলেও তিনি কখনও 'কল্লোল' বা 'কালি-কলম' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'belated Kollolean' আখ্যা দিয়ে তাঁর রচনাকে 'Of Kollol in spirit' বলে অভিহিত করেছেন। আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন'। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, 'কল্লোল'-লেখকগোষ্ঠীর রচনায় যৌবনের যে 'ফেলিল উচ্ছাস' তা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে অনুপস্থিত। বরং কল্লোল-পরবর্তী লেখকেরা যখন যৌবনমত্ততার বাঁধহীন আবেগকে অনেকখানি সংহত, সংযত ও জমাটবদ্ধ করে তুলছেন, সেই পর্বের অন্যতম লেখক হলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত এক আধুনিক সাহিত্যরীতি ও সাহিত্য-আঙ্গিক প্রবর্তন করার প্রয়াস থেকে কল্লোলযুগের সাহিত্যযাত্রা শুরু হয়েছিল। পশ্চিমী সাহিত্যের হাত ধরে এঁদের সাহিত্যাদর্শ গড়ে উঠেছিল। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি নানাদিক থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতার ভান্ডার সমৃদ্ধ হলেও শেষপর্যন্ত কিন্তু ঐ লেখকেরা সঠিক অর্থে সমাজ-সত্য আবিষ্কারের গভীরতায় পৌঁছোতে পারেননি। তবে কোন কোন লেখক যেমন জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক বাংলা কথাসাহিত্যকে প্রচলিত পথ থেকে ভিন্ন মার্গে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করেছিলেন। জগদীশ গুপ্তের অন্তশ্চারী মনোবিশ্লেষণ, শৈলজানন্দের আঞ্চলিক জীবনানুসন্ধান, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাঢ়ভূমির প্রকৃতি ও জীবনকে আবিষ্কার করার অভূতপূর্ব সাধনা, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানবজীবনকে একাত্ম করে গড়ে তোলার প্রয়াস ইত্যাদি বাংলা কথাসাহিত্যকে বহুমাণিক হয়ে ওঠার পথে অনেকখানি অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সমসাময়িক এই সাহিত্যিকদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন, কিন্তু প্রায় কারও রচনায় তিনি নির্মোহ সমাজদৃষ্টি, আবেগরাহিত্য, আদর্শবাদ অপেক্ষা বাস্তবজীবনের সত্য আবিষ্কারের প্রয়াস পুরোমাত্রায় লক্ষ্য করেননি।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-উপন্যাস পাঠ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে 'জনজীবনের' অনুপস্থিতি ও বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসার সঠিক প্রতিফলন না ঘটা-এদুটি বিষয় তাঁকে রবীন্দ্রবিমুখী করে তোলে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিহূত করেছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ রচনায় তিনি দেখেছিলেন যুক্তিহীন আবেগের প্রবল প্রবাহ-তাই শরৎচন্দ্রও শেষপর্যন্ত তাঁর আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠেননি। শৈলজানন্দ, তারাশংকর, বিভূতিভূষণরাও তাঁর 'মনের মানুষ' নয়-সেজন্য বাংলা কথাসাহিত্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব পথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। সে-পথ প্রসারিত মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষদের অপরিপাটি সংসারে, কখনো

তাদের আদিম-বিকৃত বা ভোগবাদী মনস্তত্ত্বের কুটিল কাটাজালে, কখনও বিবাহবর্হিভূত সম্পর্কের টানাপোড়েনে, কখনও নিষিদ্ধ প্রণয়ের নিয়তি-তাড়িত হাতছানিতে, কখনো সমাজের বিশেষ আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় নর-নারীর হৃদয়সম্পর্কের মূল্যায়নে এবং কখনো সামাজিক বিন্যাসের বিষম ব্যবস্থাপনায়। আরও অনেক মাত্রা (Dimensia) খুঁজে পাওয়া যাবে মাণিক-উপন্যাসে কিংবা ছোটগল্পে।

জীবনের প্রতি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল অসীম কৌতুহল আর অফুরন্ত জিজ্ঞাসা। 'গল্প লেখার গল্প' রচনায় তিনি লিখেছেন,''ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের ধর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ।'' তিনি একথাও বলেছেন,''ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্পবয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে।.....মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা আকাঙ্খা অতৃপ্ত থাকার, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নীচের তলার মানুষের দারিদ্র-পীড়িত জীবনে।'' শ্রেণীবৈষম্যের এই উৎকট ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের আশাতেই তিনি মার্কসীয় চিন্তাধারাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। শুধু মানসিকভাবেই নয়, মার্কসবাদকে তিনি জীবনের কর্মকান্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন-যেমন একজন দলীয় রাজনৈতিক কর্মী নিয়ে থাকেন।

মার্কসবাদ তাঁকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, একসময় তাঁর মনে হয়েছিল যে, মার্কসবাদে দীক্ষা নেওয়ার আগে তাঁর রচিত সাহিত্যসমূহ নিতান্তই অবাস্তব এবং ভ্রান্ত। 'লেখকের কথা'য় তিনি লিখেছেন, মার্ক্সবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আশাবাদী করেছি, জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।''

সাহিত্যক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে শরৎচন্দ্রধর্মী গল্প 'অতসীমামী' দিয়ে (১৯৩২)। গল্পটি আদর্শবাদের।এখানে রোমাঞ্চ-রসও আছে, তবে লেখকের বাস্তবতাবোধও অগ্রাহ্য করার মত নয়। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'জননী'কেও লেখকের স্বকীয় বাস্তবতাবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় এই উপন্যাসে ''মাতৃত্বকে দেবীত্বের পর্যায়ে পৌঁছাইবার কোন কাব্যসুলভ কৃত্রিম চেষ্টা নাই।'' তবে প্রথম দুটি রচনার মধ্যেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক সাহিত্যধারার ঊর্ধ্বে উঠে বিশেষ কোন নতুনত্বের প্রবর্তন করতে পারেননি।

১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে যথাক্রমে প্রকাশিত 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানব-মনস্তত্ত্বের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রহস্যময় রূপ অঙ্কণ করেছেন।ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব এখানে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানবচরিত্র বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছে।

আঞ্চলিক উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'তে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক প্রতিভার সম্যক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পদ্মার তীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের এক অবূতপূর্ব বাস্তব জীবন-আলেখ্য এই উপন্যাসটি। পূর্ববঙ্গের ভূপ্রকৃতি, লোকজীবন, লোকচরিত্রের মুখের

টিপ্পনী

জীবন্তভাষা, সেখানকার উৎসব-অনুষ্ঠান-জীবনচর্যা এবং স্থূল জীবনভাবনা অসাধারণ দক্ষতায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৯৪৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করার পর মার্কসীয় সমাজ দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির সম্বাবনার দিকটি তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। তাঁর 'শহরতলীর ইতিকথা', 'শহরবাসের ইতিকথা', 'ইতিকথার পরের কথা', শান্তিলতা, 'মাঝির ছেলে' ইত্যাদি উপন্যাসে সেই সচেষ্টতা লক্ষিত হবে। 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে সুন্দরবনের পরিবেষ্টনে কৃষিজীবি ঈশ্বর বাগদীর কারখানার শ্রমিকে পরিণত হওয়ার মধ্যে কৃষিজীবনের অবক্ষয়ের দিকটিকেই ঔপন্যাসিক ইঙ্গিত করেছেন। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' ছোটগল্পেও ভূমিহীন ভাগচাষী গফুরের ফুলবেড়ের চটকলের সস্তা শ্রমিকে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যেও গ্রামীণ কৃষি-ব্যবস্থার ভাঙনের দিকটি বড় হয়ে উঠেছিল।

টিপ্পনী

কমিউনিষ্ঠ ভাবধারার প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করার আগে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করেছিলেন, সেগুলি হল-

'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য'(১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা'(১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৬), 'জীবনের জটিলতা' (১৯৩৬), অমৃতস্য পুত্রাঃ(১৯৩৮), 'শহরতলী'(১ম পর্ব ১৯৪০, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪১); 'অহিংসা'(১৯৪১), 'ধরাবাঁধা জীবন' (১৯৪১), 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩)।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়ার পর রচিত উপন্যাসে যে সমস্ত নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল, সেই শ্রেণীর উপন্যাসগুলি হল-

'দর্পণ'(১৯৪৫), 'শহরতলির ইতিকথা'(১৯৪৬), 'চিন্তামণি'(১৯৪৬), 'চিহ্ন'(১৯৪৭), 'আদায়ের ইতিহাস'(১৯৪৭), 'চতুষ্কোণ'(১৯৪৮), 'জীয়ন্ত'(১৯৫০), 'পেশা'(১৯৫১), 'স্বাধীনতার স্বাদ'(১৯৫১), 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম পর্ব ১৯৫১, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৫২), 'ছন্দপতন'(১৯৫১), 'ইতিকথার পরের কথা'(১৯৫২), 'পাশাপাশি'(১৯৫২), 'সার্বজনীন'(১৯৫২),'আরোগ্য'(১৯৫৩), 'নাগপাশ'(১৯৫৩), 'তেইশ বছর আগে'(১৯৫৩), 'চালচলন'(১৯৫৩), 'শুভাশুভ'(১৯৫৪), 'হরফ'(১৯৫৫), 'হলুদ নদী সবুজ বন'(১৯৫৬), 'মাশুল'(১৯৫৬), 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান'(১৯৫৬), 'মাটিঘেঁষা মানুষ'(অসমাপ্ত উপন্যাস ১৯৫৭), 'শান্তিলতা'(১৯৬০), 'মাঝির ছেলে'(১৯৬০)।

ছোটগল্প রচনাতেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রথম পর্বে রচিত তাঁর ছোটগল্পগুলিতে আদিম জৈব প্রকৃতি, তথাকথিত সভ্যমানুষের অর্থলিপ্সা ও যৌন কামনা, পরবর্তী পর্বে ধনিক শ্রেণীর শোষণ, রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যয় ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত হযেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে-'অতসীমামী', 'সরীসৃপ', 'মিহি ও মোটা কাহিনী' প্রাগৈতিহাসিক, ভেজাল ইত্যাদি।

তাঁর বহুপঠিত এবং বহুপরিচিত ছোটগল্পগুলির কিছু গল্পের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। যেমন-'নেকী', 'সর্পিল', 'আগন্তুক', 'বৃহত্তর ও মহত্তর', 'মহাকালের জটার জট', 'বিষাক্ত প্রেম', 'সরীসৃপ', 'শৈলজ শিলা', 'ফাঁসি', 'ধনজনযৌবন', 'মৃতজনে দেহ প্রাণ', 'হারাণের নাতজামাই', 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', 'কুষ্ঠরোগীর বউ', 'লেখকের বউ' ইত্যাদি।

পদ্মানদী-চারিত্রিক উত্তরণ

বাংলাদেশের ভয়াল ও রুদ্ররূপিনী কীর্তিনাশা পদ্মানদীর অনুষঙ্গে পদ্মার তীরবর্তী ধীবরজীবনের এক অসামান্য শিল্প-দলিল হল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি। উপন্যাসের শীর্ষনামে মাঝি-সম্প্রদায়ের প্রাধান্যই সৃষ্টি হয়, কিন্তু ঘটনা-বয়নের রীতিটি অনুসরণ করলে বোঝা যায় পদ্মানদীর প্রাসঙ্গিকতা এই উপন্যাসে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত: পদ্মানদী ও এই নদীর সঙ্গে জীবন-জীবিকার অনিবার্য তাগিদে জড়িত ধীবর-সম্প্রদায়ের জীবনের এক মর্মস্পর্শী যুগলবন্দী হল এই উপন্যাসটি। জড় প্রকৃতি হলেও সে প্রায়শ:ই আলোচ্য উপন্যাসের একটি চরিত্র হয়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

টিপ্পনী

পদ্মার সাধারণ পরিচিতি ভয়ংকরী রাক্ষসী নদী হিসাবে। পূর্ববঙ্গের এই নদী-তীরবর্তী জনজীবন বিভিন্ন সময়ে এই নদীর দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। জাওডি ব্যারোম থেকে রেনেল-অঙ্কিত নক্সাপলি বিশ্লেষণ করলে এই নদীর ভাঙ্গা-গড়ার ইতিবৃত্তটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সচেতনভাবেই এই খেয়ালী নদীটিকে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি করেছেন।

উপন্যাসটি আদ্যন্ত পাঠ করলে দেখা যাবে যে, এখানে পদ্মার অনুপুঙ্খ বর্ণনা প্রদানের দিকে ঔপন্যাসিকের তেমন ঝোঁক নেই। অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ জুড়ে কিংবা পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদান্তরে তিনি পদ্মার ভয়ংকর বা শান্ত-সুন্দররূপের আনুপূর্বিক বর্ণনা তিনি দেননি, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে উপন্যাসে বর্ণিত জনজীবনের সক্রিয় পটভূমি এই পদ্মানদী। কড়ি ও কোমলের দ্বৈতরূপের বৈচিত্র্যে পদ্মা তার তীরলগ্ন মানুষগুলিকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। সেই বন্ধন কখনো মৃত্যুফাঁস আবার কখনো জীবনদায়ী। পদ্মাকে উপন্যাস-ঘটনায় ব্যবহার করার কৌশল-কৃতিত্বে সে প্রাণহীন নিসর্গ-প্রকৃতির বৃত্ত অতিক্রম করে প্রাণবলে জগতে প্রবেশ করেছে।

পদ্মার তীরবর্তী ধীবর জনগোষ্ঠীর জীবননির্বাহে পদ্মার অমোঘ প্রভাব কত সুদুরপ্রসারী তার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের সূচনায় পদ্মায় ইলিশমাছ ধরার মরশুমের জন্য ঐ গোষ্ঠীর মানুষদের বৎসরব্যাপী প্রতীক্ষায়। এই প্রতীক্ষার কারণ ''ইলিশের মরশুম ফুড়াইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোন্‌খানে যে সে তার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।'' জড়-অচেতন পদ্মার উপরে ঔপন্যাসিক এখানে চেতনের ধর্ম আরোপ করেছেন এবং একই সঙ্গে তাকে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে, প্রাত্যহিক জীবনচর্চায়, হাসি-কান্না-দুঃখে, অভিমানে-ক্রোধে-ইর্ষায়, আদিম ধ্বংসময়ী প্রবৃত্তির তাড়নায় অবচেতনের বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা 'ক্ষুধার্ত সরীসৃপের মত প্রবৃত্তির দংশন কামনায়' পদ্মা এই উপন্যাসে আশ্রিত চরিত্রগুলির সহচরে রূপান্তরিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক প্রায় কখনোই পদ্মাকে এই উপন্যাসের নিষ্ক্রিয় ক্যান্‌ভ্যাস্ করে উপস্থাপিত করেননি, পদ্মার উপস্থিতি এখানে কোনো ঘটনা, কোনো চরিত্র বা গোষ্ঠীজীবনের পরিপূরক হিসাবে।

ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মারও রূপের পরিবর্তন ঘটে। দিন কাটে, জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙ্গন-ধরা তীর ধ্বসে পড়ে, নতুন চর ওঠে জেগে। ঋতুচক্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদ্মার মতই জেলেপাড়ার জীবনের পৌনঃপুনিক

উত্থান-পতনের কাহিনীও অগ্রসর হয়। আবার পদ্মা কখনও হয়ে ওঠে মানুষের সংগ্রামীশক্তি, জীবনীশক্তি ও অস্তিত্বের পরিপূরক-''পদ্মা যাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে পদ্মার বুকে যত ঢেউ থাক মাইল দেড়েক সাঁতার দিয়া তীরে ওঠা তার পক্ষে কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব নয়।'' আবার পদ্মা কখনো জীবনের 'Contrast' বা বৈপরীত্যধর্মী ব্যঞ্জনার দ্যোতক হয়ে ওঠে-আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্রকাশ ও শ্যামলতনু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, ও সব কিছু যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জনস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিকে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা।''

টিপ্পনী

পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনে যে প্রেম তা দ্বিস্তরভিত্তিক-একটি গার্হস্থ্য জীবনের দাম্পত্য প্রেম-যেখানে কামনা-বাসনা-অনুরাগ-অভিমান ও জৈবজীবনের টানাপোড়েন; আর অন্য স্তরে রয়েছে অনন্তযৌবনা পদ্মার ছলাকলাময়ী অনন্ত রূপমাধুরী পানের নৈসর্গিক প্রেম-সেই প্রেমের 'তলতালাস' পদ্মানদীর মাঝিরা পায় না। ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন কুবের নদীকে ''বড় ভালোবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মত সুখ আর নাই।...নতুন পৃথিবীকে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ?''

পদ্মা অন্যদিকে আবার সর্বজাতি ও ধর্মমিলনের পরিত্র তীর্থক্ষেত্র-লৌকিক জীবনের সকল-সংকীর্ণতা এখানে যেন কোমন করে ধুয়ে মুছে যায়। কুবের তাই ভাবে-''কি ক্ষতি মুসলমানের রান্না খাইলে? ডাঙার গ্রামে যাহারা মাটি ছানিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদের ধর্মের পার্থক্য তাক, পদ্মানদীর মাঝিরা সকলে একধর্মী।'' এমনি করেই পদ্মার সূক্ষ বিস্তার ''জৈবিক থেকে আত্মিক, দৈহিক থেকে আধ্যাত্মিক ও মানবিক'' ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে যায়। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যেতে পারে, ''পদ্মানদীর মাঝির দল ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ পৃথিবীর মানুষ হতে পারে, কিন্তু তাদের চারপাশে পদ্মার যে রহস্যময় বিপুল বিচিত্র তরঙ্গধারা নিয়ত প্রবাহিত, সেই পদ্মাপ্রবাহই এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মত তাদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসে বহুতর সম্ভাবনাকে। সে সম্ভাবনা 'আতঙ্কে উল্লাসে', আশা-আকাঙ্খায় জড়াো এক বিচিত্র রহস্য।''

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার হিংস্র উত্তাল রূপের বর্ণনা-পরিসর যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্তির মধ্যেই ঔপন্যাসিক পদ্মার নিষ্ঠুর রুদ্ররূপের এক সর্বগ্রাসী চিত্র অঙ্কণ করেছেন। পদ্মার কালান্তক বন্যা আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিনে পদ্মার ভয়ংকর রূপ .....জীবনের অস্তিত্বের মূলেই প্রবল টান দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাত প্রভৃতি ধীবর জীবনের আশ্রয়স্থলেরই মূলোৎপাটন করে না, তাদের ঘরের লোক, প্রিয়জন যারা দূর পদ্মায় মৎস্য-শিকারে যায় তাদের জীবন-মরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়-''কেহ ফিরিবে প্রভাতে, কেহ ফিরিবে না।.....ভীত বিবর্ণমুখে কাঁদিতে কাঁদিতে জেলেপাড়ার নরনারী পদ্মাতীরে গিয়া দাঁড়ায়, আরক্ত চোখে চাহিয়া থাকে উন্মত্ত জলরাশির দিকে।'' আর বর্ষার পদ্মার উদ্দাম তীব্রস্রোত ''গ্রামের ঘরবাড়ি, গোরু-মানুষ কুটার মত ভাসাইয়া লইয়া''যায়।

'পদ্মানদীর মাজি'তে পদ্মানদী স্থূল বাস্তবকে অতিক্রম করে মানবমনের নিগূঢ় রহস্য-অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হয়েছে। পদ্মার উতরোল প্রবাহ কুবেরের মত আপাতবৈচিত্র্যহীন মানুষের জীবনেও প্রচন্ড আবেগ ও কামনার তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলেছে। কপিলার প্রতি কুবেরের দুর্মর আকর্ষণ যেন পদ্মার আদিম অপ্রতিরোধ্য জীবনপিপাসারই সমগোত্রীয়। পদ্মা মানুষের সুখের ঘর ভাঙ্গে; কুবেরও মালার সুখের সংসারে কপিলার দীর্ঘশ্বাসকে আবাহন করে আনে। মালা আর কপিলার প্রকৃতিগত দিক বিচার করলেও পদ্মানদীর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। পদ্মার যেমন

একদিকে রয়েছে শান্ত নিস্তরঙ্গ রূপ, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে উত্তাল যৌবনবতীর চঞ্চল লাস্যরূপ-মালা পদ্মার শান্ত নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি, আর কপিলা পদ্মার ভয়ংকরী-ভৈরবী রূপ।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়ক চরিত্র কুবের দারিদ্রের কারণে স্বনির্ভর জেলে হয়ে উঠতে পারেনি- পদ্মা কুবেরের এই দারিদ্রকে ক্ষমা করেনি, আর সেজন্যই পরনির্ভরশীল কুবের পদ্মার 'গহীন' তেকে নিজের খুশীমত মীনসন্তানদের হস্তগত করতে পারেনি। পদ্মা এমনি করেই দরিদ্র কুবেরের জীবনকে অনেকখানিই গ্রাস করেছে, আর কপিলাও পদ্মার মতই কুবেরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

টিপ্পনী

বস্তুতঃ 'পদ্মানদীর মাঝি'তে ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে পদ্মা। এই নদীর অপরিহার্য যোগসূত্র ব্যতিরেকে দরিদ্র কুবের, গণেশ, ধনঞ্জয়, রাসু, মালা, কপিলা, পীতমমাঝি কারও জীবনের বাস্তব সমস্যার উন্মোচন সম্ভব হত না। সর্বোপরি হোসেন মিয় চরিত্রের পূর্ণতাদানে এবং ময়নাদ্বীপে তার নতুন উপনিবেশ গড়ার স্বপ্নকে সার্থক করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে পদ্মানদী। পদ্মার খামখেয়ালী স্বভাবের জন্যই রিক্ত ধীবরদের হোসেন মিয়া তার স্বপ্নের উপনিবেশে পুনর্বাসন দেওয়ার সুযোগ লাভ করেছে।

তবুও শেষপর্যন্ত এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক পদ্মার ভূমিকাকে নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। উপন্যাসের পরিণামে কুবের-কপিলা কার্যতঃ পদ্মার অনুষঙ্গ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে-এর ফলে পদ্মা এই উপন্যাসে তার চারিত্রিক গুরুত্ব অনেকখানি হারিয়েছে। আসলে দুরন্ত পদ্মার বুকে জীবিকাসন্ধানী মরিয়া মানুষদের কঠোর সংগ্রামের রূপটি উপন্যাসে সরাসরি অঙ্কিত হলে প্রকৃতি ও মানুষের দ্বৈরথ আরও বেশী দ্বন্দ্ব-সংকুল হত। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করে পরিশেষে বলা যায়-''ইহা ততটা নদীতে মাছ ধরার কাহিনী নহে, যতটা নদী হইতে গৃহে-প্রত্যাগত ধীবরের গার্হস্থ্য জীবন ও হৃদয়-সমস্যার অশান্ত আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ।''

আঞ্চলিকতার অনুষঙ্গে 'পদ্মানদীর মাঝি'

জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের রয়েছে একটা নিবিড় যোগাযোগ; অনেক সময় মনে হয় জীবন এবং উপন্যাস যেন সমার্থক। এই একান্ত জীবনমুখীনতা থেকেই উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যেমন এসেছে বহুবৈচিত্র্য, তেমনি জীবনের রঙ্গকে সঠিকভাবে বিচ্ছুরিত করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে উপন্যাসের নানা প্রকরণ বা শ্রেণী। 'রিজিওন্যাল নভেল' বা আঞ্চলিক উপন্যাস সেইরকমই একটি প্রকরণ। বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং পরিকল্পনার সুবিধার জন্য আসলে অঞ্চল কথাটি সৃষ্ট হয়েছে। ভূগোলবিদ্দের দৃষ্টিতে অঞ্চল দু'প্রকার-সমপ্রকৃতি অঞ্চল এবং কেন্দ্রবিন্দু অঞ্চল। উপন্যাস যদি কোন অঞ্চলভিত্তিক হয়, তবে সেই আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে একটি বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলের অখন্ড নিবিড় অনুষঙ্গ ফুটে উঠবে; সেই অনুষঙ্গে থাকবে সেখানকার ভাষা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি। দ্বিতীয়তঃ চরিত্র ও কাহিনীর মধ্যে থাকবে ঐ বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অমোঘ প্রভাব এবং তৃতীয়তঃ আঞ্চলিক উপন্যাস বা সাহিত্য বিশেষ অঞ্চলের মুখপাত্র হয়েও তার শিল্পরূপের বিচারে সর্বজনীন জীবন-সত্যের দ্যোতক।

সমগ্র দেশ নয়, একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতি বা ভৌগলিক পরিপ্রেক্ষিত এবং পরিপ্রেক্ষিত বা পটভূমির সান্নিধ্যে লালিত ও পরিপালিত মানবগোষ্ঠীর জীবনচর্চার চিত্তই মূর্ত

হয়ে ওঠে আঞ্চলিক উপন্যাসে। সুতরাং অঞ্চলভিত্তিকতাই আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রাথমিক লক্ষণ। আঞ্চলিকতার এই লক্ষণ বা লক্ষণসমূহ ফুটিয়ে তোলার জন্য উপন্যাস আশ্রিত অঞ্চলের লোকচরিত্রের আচার-আচরণ, সমাজজীবন ও পারিবারিকজীবনের নানা খুঁটিনাটি দিক, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জল-মাটি-বৃক্ষ-লতা-অরণ্যানী সবকিছুই সেখানে অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও প্রীতিময়তার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়। এই চিত্রায়ণের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে ঔপন্যাসিকের অঞ্চলটির প্রতি গভীর মমতা, জীবনাভিজ্ঞতা এবং আঞ্চলিক-জীবনসংশ্লিষ্ট বাস্তববোধ। রবার্ট লিডেলের মতে বিশেষ একটি অঞ্চলের পটে গোষ্ঠীবদ্ধ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য জীবনচাঞ্চল্যই আঞ্চলিক সাহিত্যের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আঞ্চলিক উপন্যাস পাঠ করার পর পাঠকের যেন কখনোই মনে না হয়-"It is too local". অতিমাত্রিক স্থানিক বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে পরিহার করার জন্য ঔপন্যাসিককে সাহিত্যের সর্ব্বজনীনতার সূত্রটিকে অনুসরণ করতে হবে।

টিপ্পনী

বাংলা উপন্যাসধারায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাসের অভিধা অর্জন করেছে। পূর্ববঙ্গের দুরন্ত ধ্বংসময়ী ভয়াল নদী পদ্মার পটভূমিকায় দরিদ্র, অসহায় ও নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত ধীবরজীবনের এক অসামান্য বাস্তব আলেখ্য হল 'পদ্মানদীর মাঝি'। রহস্যময়ী ভয়ংকরী কীর্তিনাশা পদ্মানদী এবং তার তীরবর্তী ধীবরদের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং কঠোর জীবনসংগ্রামের বাস্তবরূপ যেন এখানে শুধু জড় প্রকৃতি নয়, স্বতন্ত্র চরিত্রমহিমায় মহিমান্বিত উপন্যাসেরই এক বিশিষ্ট চরিত্র। পদ্মানদীর প্রেক্ষাপটে 'আঞ্চলিকতার বৃন্তে' প্রকৃতি-নির্ভর একদল ব্রাত্য, দরিদ্র, অবহেলিত কিন্তু জীবনঘনিষ্ট মানুষের চিরায়ত রূপটিকেই 'পদ্মানদীর মাঝি'র লেখক তাঁর কাহিনীতে প্রকটিত করেছেন-সেই অর্থে প্রাথমিক বিচারে উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে আঞ্চলিকতার লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মানদীর অনুপুঙ্খ বর্ণনা না থাকলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এই উপন্যাসে অঙ্কিত সমগ্র জনগোষ্ঠীর পশ্চাতে প্রাকৃতিক পটভূমি হিসাবে পদ্মানদী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কড়ি ও কোমল-পদ্মার এই দ্বৈত রূপ। এই দ্বৈতরূপেরই প্রভাব পড়েছে তার তীরবর্তী মৎস্যজীবী মানুষগুলির জীবনে এবং শেষতঃ তারা বাঁধা পড়েছে পারস্পরিক অচ্ছেদ্য বন্ধনে। সেই বন্ধনে কখনো রয়েছে মর্মবিদারী মৃত্যুযন্ত্রণা, আবার কখনো রয়েছে সোহাগী স্পর্শ। পদ্মা প্রকৃত অর্থেই এখানে আঞ্চলিকতার এক প্রতিভূ চরিত্র।

উপন্যাসটির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এবং ঔপন্যাসিকের শিল্প-অভিমুখ কিন্তু পদ্মার অন্তর্নিহিত রূপ উন্মোচন করা নয়, এখানকার মুখ্য উপজীব্য হল পদ্মানির্ভর ধীবর বা জেলেসম্প্রদায়। বস্তুতঃ উপন্যাস-আশ্রিত চরিত্র ও ঘটনাকে পরিস্ফুট করার জন্যই এখানে পদ্মানদীকে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার একথাও সমানভাবে সত্যি যে, পদ্মানদী এই উপন্যাসের নিছক শোভাবর্ধক চালচিত্রও নয়। প্রকৃতপক্ষে পদ্মা তার তীরবর্তী মানুষগুলির জীবনের সঙ্গে জড়িত থেকে এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে উপন্যাসঘটনায় তার স্বকীয় উপস্থিতি তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলেছে। এই অর্থে উপন্যাসের আঞ্চলিক আবহাওয়া রচনায় তার একটি সর্বত্রসঞ্চারী ভূমিকা আছে।

শুধু পদ্মানদী নয়, পদ্মার তীরলগ্ন ধীবরদের গ্রাম, বাসগৃহ, সেখানকার শোষণ-বঞ্চনা, হাসি-কান্না, চারিত্রিক নানা বৈশিষ্ট্য এখানে পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিকতার বিশ্বাসযোগ্য বিশিষ্টতা নিয়ে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই উপন্যাসে পদ্মানদীর মাঝিদের গ্রামের

যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্যের অনুকূল। 'অপরিসর বায়ুলেশহীন জমাটবদ্ধ জেলেপাড়া', কিংবা সেখানকার জানালা-দরজা বিরল চালাঘর, বাঁশের পায়ার উপর বাঁশের মাচা, 'তৈল-চিক্কা' বালিশ, ছেঁড়া কাঁথা, মাটির হাঁড়ি-কলসি, মুসলমানপল্লীর বিশেষত্বমন্ডিত বাসগৃহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় পূর্ববঙ্গের জেলেদের দারিদ্র, অসহায়তা, অর্থকষ্টবিড়ম্বিত সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন এবং ক্রূর নিয়তির কাছে প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের আঞ্চলিক জীবনের স্বরূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শুধু এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বর্ণনাই নয়, এখানকার মানুষদের জীবনচর্চার বর্ণনায় লেখক কত বস্তুবাদী তার পরিচয় পাই যখন তিনি বলেন-'' জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ-সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে।''

পদ্মার নির্মম প্রকৃতি জেলে পল্লীর জীবনচর্চায় যে নির্মমতার ছাপ এঁকে দেয়, তার নিদর্শন জেলে-রমণীদের পরিদৃষ্ট হয়। সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, সন্তানের জন্মদান, লালন-পালন, নবজাত সন্তানকে 'পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা' করা, বয়স্ক সন্তানের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন, এমনকি ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়া-কান্না কাঁদে' ইত্যাদি কথা। এছাড়াও তারা সংসারের জন্য দিবারাত্র খাটে, বাড়ী বাড়ী মাছ বিক্রী করে- নারী চরিত্রের এই সক্রিয়তার দিকটিও লেখক এখানে তুলে ধরতে ভুল করেননি।

আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে প্রত্যন্তবাসী গোষ্ঠীজীবনের যে বিভিন্ন দিক অঙ্কিত হয় তার সামগ্রিক রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য উপন্যাসে মানবগোষ্ঠীর পূজা-পার্বন, সংস্কার-কুসংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, উৎসব-অনুষ্ঠানাদির পরিচয় থাকাটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে ধীবর সম্প্রদায়ের ঘটনাবিরল, নিরুত্তাপ ও প্রায় গতিহীন জীবনের তিনটি উৎসবের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি রথযাত্রা, দুর্গাপূজা ও দোল-উৎসব। সোনাখালির রথ, রথের মেলা, রথের মেলায়-কেনা সস্তা কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা, মাটির পুতুল দরিদ্র জেলেদের ঘরে আনন্দের জোয়ার বয়ে আনে। হতদরিদ্র জেলে-রমণীরা নতুন শাড়ী নাড়াচাড়া করার সুযোগ পায় এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই। আবার কেতুপুরের দুর্গোৎসবের ধুম, ঠাকুর-দেখা, তাড়ি খেয়ে মাতলামি করা ইত্যাদির মধ্যেও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক লোকজীবনের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট। দোলের দিনে রঙ-কাদা নিয়ে মাখামাখি করার চিত্র গ্রাম্য দোল-উৎসবের চিত্রটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, এই সব উৎসবের বর্ণনায় জেলে-জীবনের কোন বর্ণবহুল অবাস্তব রূপ অঙ্কণে প্রলুব্ধ হননি, বরং তাদের দুর্দশাগ্রস্ত অর্থানতিক জীবনকেই পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃপক্ষে তিনি তাদের ইর্ষা-দ্বন্দ্ব, প্রীতি-ভালোবাসা-কলহ-সংকীর্ণতার আদিম দরিদ্রজীবনের গন্ডীবদ্ধ বাস্তবরূপটি নির্মোহ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে অন্বেষণ করতে চেয়েছেন।

আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এখানে লোকচরিত্রের মুখে ব্যবহৃত পূর্ববঙ্গের অকৃত্রিম উপভাষা বা Dialect- চরিত্রগুলির মুখে পূর্ববঙ্গীয় এই কথ্যভাষার ব্যবহার যেমন একটি শেষ ভৌগলিক অঞ্চলের নিজস্ব 'আইডেন্টিটি' বা পরিচিতিকে স্পষ্ট করে তেমনি চরিত্রগুলিকেও করে একাধারে বাস্তব ও জীবন্ত।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এসব সত্ত্বেও ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে-শিল্পগত কয়েকটি কারণে।

প্রথমতঃ- আঞ্চলিক উপন্যাসের কাহিনী একটি অতিব্যাপ্ত ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং চরিত্রগুলি হয় ঐ অঞ্চলেরই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। আলোচ্য উপন্যাসে যদিও পদ্মার তীরবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চল পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু হোসেন মিখার ময়নাদ্বীপ এবং সেই দ্বীপে বসতিস্থাপনের জন্য যাতায়াত ইত্যাদি ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ আঞ্চলিক উপন্যাসে যে সীমা-সংহতি একান্ত কাম্য, সেই সীমা-সংহতির শর্তকে লঙ্ঘন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ- আঞ্চলিক উপন্যাসে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার স্থলে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার প্রাধান্য থাকে, কিন্তু ‘পদ্মানদীর মাঝি’ মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস-কুবের এই উপন্যাসের নায়ক।

তৃতীয়তঃ- উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে তখনই যখন স্থানিক জীবন-বিন্যাসের উপর কোন বহিঃস্থ শক্তির সংঘাতে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার রূপায়ন ঘটে। কিন্তু ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে সেই জাতীয় কোন সংঘাত নেই।

কিন্তু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও ‘পদ্মানদীর মাঝি’ একটি আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে বলেই মেনে মেওয়া যেতে পারে। কারণ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গীটি সর্বদাই এ উপন্যাসে একটি বিশেষ ভূ-প্রকৃতি, সেখানকার গোষ্ঠীজীবন এবং জীবনচর্যার বৃত্তটিকে ঘিরে অনুবর্তিত হয়েছে- বিচ্যুতি যেটুকু আছে তা নিঃসন্দেহে মানবমনের গভীরতা অনুসন্ধানের কারণেই।

কুবের চরিত্র-জন্মগত ও পরগত

উপন্যাস বা কথাসাহিত্য কতকগুলি চরিত্র-সমবায়ে গঠিত হয়। সেই চরিত্রগুলি জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে আবর্তিত কিংবা নানা সমস্যার জালে জড়িত অথবা বিবিধ অনুভূতির দোলায় দোলায়িত। চরিত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন- “By character I mean that in virtue of which we ascribe certain qualities to the agents’’-যে যে ধর্ম থাকায় ব্যক্তিত্বে দোয়-গুণ আরোপিত হয় চরিত্র বলতে সেই ধর্মকেই বোঝায়। এই ধর্মই এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে এবং এই ধর্ম থেকেই সমস্ত আচরণ বা কর্ম জন্মায় ও তার দ্বারাই কর্ম বিশিষ্টতা পায়। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আপেক্ষিক স্থিতিশীল বা গতিশীল দ্বন্দ্বের মধ্যেই চরিত্রের আত্মপ্রকাশ সম্পন্ন হয়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে পদ্মা এবং তার উপকূপবর্তী মৎস্যজীবী দরিদ্র অসহায় একদল মানুষের জীবন, জীবিকা ও প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের নিবিড় একাত্মতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই চিত্রে যেমন আছে কুবেরের মত ব্যক্তিচরিত্রের অধিষ্ঠান, তেমনি আছে মাঝিদের গোষ্ঠীজীবনের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য। আঞ্চলিক উপন্যাসে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার প্রাধান্য কাম্য, কিন্তু ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে মূলতঃ কুবের চরিত্রই পূর্বাপর প্রাধান্য পেয়েছে। সে-ই এই উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রটির বহুমুখী ‘আইডেন্‌টিটি’ এখানে পরিদৃশ্যমান।

কুবের নিজে একজন পদ্মানদীর মাঝি। পদ্মানদীর অপরাপর মাঝিদের মতই তার জীবন

সাদামাটা। দুঃখ ও দারিদ্র তার নিত্যসঙ্গী, জীবন-জটিলতা অপরিমেয়। এও মনে হবে যে, অন্য মাঝিদের তুলনায় তার জীবনের জটিলতা অনেক বেশী গভীরবিস্তারী। ধীবর-গোষ্ঠীর জীবনচর্চার সঙ্গে সংস্রব ব্যতীত কুবেরের জীবনের আরও কতকগুলি স্তর বা 'উপবৃত্ত' আছে। সেগুলি হল-

১) কুবের-মালার দাম্পত্য জীবনবৃত্ত

২) কুবের-কপিলা বিবাহবর্হিভূত

এবং ৩) কুবের-হোসেন-মিয়া ইতিবৃত্ত;

টিপ্পনী

এব্যাপারে প্রথম আলোচ্য হল কুবের-মালা জীবন-বৃত্তান্ত। মালা কুবেরের বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু সে জন্ম-বিকলাঙ্গ। একটি বিকলাঙ্গ রমণীকে বধূরূপে নির্বাচনের পশ্চাতে কুবেরের কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রচ্ছন্ন ছিল কিনা ঔপন্যাসিক উপন্যাসাংশে তা স্পষ্ট করেননি। ধীবর-সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত চড়া কণ্যাপণের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অভিপ্রায় কিংবা কোন ব্যক্তিগত দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদে যে কুবের বিকলাঙ্গ ও প্রায়-চলচ্ছক্তিহীন মালাকে বধূরূপে বরণ করেছিল এমনটাও মনে হয় না। বিকলাঙ্গ জেনেই সে স্বতঃস্ফূর্ত মহত্বের পরিচয় দিয়ে গৌরাঙ্গী মালাকে বিবাহ করেছিল। দরিদ্র ও অভাবক্লিষ্ট জেলে হয়ে এবং পরের নৌকায় দিনমজুরের কাজ করেও কুবের চারিত্রিক এবং মানবিক উভয় দিক থেকেই যে উদারপন্থী ছিল সে কথা মেনে নিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উপন্যাস অংশে দেখা যায়, দারিদ্র ও অভাবপীড়িত এবং বহুসংকটাকীর্ণ কুবের মালার প্রতি কোন বড় রকমের দুর্ব্যবহার করেনি। কুবের এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী চরিত্র। কারণ ধীবর-সম্প্রদায়মধ্যে ''নিষ্ঠুরতা ছাড়া স্বামীও বড় একটা হয় না।'' ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় দেখা যায়, কুবের মালার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। ঘোর বর্ষার দিনে সন্তানের জন্ম দিয়ে মালা যখন প্রায় বৃষ্টিস্নাত হয়ে ওঠে সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে, তখন পরম মমতায় কুবের তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সেভাবে হোসেন মিয়া যে তাকে শণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা দিয়ে ঘর মেরামত করে মালার কষ্ট লাঘব করতে সক্ষম হবে সে। আরও ভাবে মালার ''বুকে-পিটে..যে অল্প ব্যথা হইয়াছে, কদিন এখানে থাকার ফলে সেটা বাড়িয়া না গেলেই বাঁচা যায়।'' আবার কখনও ''কুবের কলসী খুঁজিয়া পিসির নিজের জন্য লুকানো কতকগুলি চিড়া মালাকে আনিয়া দেয়।'' মালা যখন তার মোহিনী ভাষা দিয়ে ছেলেমেয়েকে রূপকথা শোনায় তখন কুবেরও মহোৎসাহে সে গল্প শোনে। কুবের সদ্যজাত পুত্র সম্পর্কে যখন জেলেপাড়ায় বিরূপ সমালোচনা হয়, তখন কুবের আন্তরিকভাবে স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে না। তবে সময়ান্তরে মালার প্রতি কুবেরের ক্রোধ, কটুবাক্য প্রয়োগ অথবা রূঢ় আচরণ কোন তাৎক্ষণিক বা সাময়িক-কারণপ্রসূত বলেই মনে হয়। এর পিছনে তার সংসারের দারিদ্র, অভাব, জীবিকার অনিশ্চয়তা, নিজের অক্ষমতা ইত্যাদি কারণ সক্রিয়ভাবে উপস্থিত রয়েছে। মালার মধ্যে বিকলাঙ্গত্ব ঘুচিয়ে সুস্থ-জীবন ফিরে পাওয়ার একটা দুর্মর আকাঙ্খা ছিল। কিন্তু মালার পঙ্গু পা হাসপাতালে দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কুবেরের যে অজুহাত বা ঔদাসীন্য তার মূলে যে কারণ তা হল কুবের জালে মালার পা কখনোই ভালো হওয়ার নয়। এছাড়া তার সংসারের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যও এক্ষেত্রে একটি প্রধান কারণ।

কিন্তু কুবেরের জীবন এত সরলরৈখিক নয়। সংসার ও দাম্পত্যজীবনের ঊর্ধ্বে রয়েছে তার জীবনের আরও তীব্রতর জটিল প্রবাহ। সেই জটিলপ্রবাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে

টিপ্পনী

এই উপন্যাসের অন্যতম এক সক্রিয় চরিত্র হুসেন মিয়ার। হোসেন মিয়ার সঙ্গে কুবেরের যোগাযোগের মূলে আছে কুবেরের সংসারের আর্থিক ভগ্নদশা। দ্বিতীয়তঃ ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এক্ষেত্রে কুবের বাধ্য হয়েই হোসেন মিয়ার শরণাপন্ন হয়েছিল। হোসেন মিয়ার স্বপ্ন ছিল ধূ ধূ সমুদ্রের মাঝখানে অবস্থিত মনুষ্যহীন ময়নাদ্বীপে 'নয়াবসত' গড়ে তোলার-এটা একধরনের ঔপনিবেশিক মানসিকতা। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসকের শোষণ-মানসিকতা সেই অর্থে হোসেন মিয়ার নেই; তার স্বপ্ন ময়নাদ্বীপকে মনুষ্যমুখরিত করা। এজন্য সে দরিদ্র ধীবর, অসহায় কৃষক বা বিপন্ন মানুষকে ময়নাদ্বীপে নিয়ে যাওয়ার নেশায় মত্ত হয়েছে। কুবেরও ঘটনাচক্রে একসময় হোসেন মিয়ার সেই সর্বপ্রসারিত ফাঁদে অজগরের বিষনিঃশ্বাসে আকৃষ্ট হরিণশিশুর মত স্বেচ্ছাবন্দী হয়েছে। বস্তুতঃ কুবেরের জীবন-পরিণতিতে হোসেন মিয়ার প্রভাবই সর্বাধিক-পদ্মানদী নয়।

কুবেরের আটপৌরে জীবনে বেগবতী পদ্মার তীরভাঙ্গা কনকল্লোল নিয়ে এসেছে লাস্যময়ী কপিলা-সম্পর্কে সে কুবেরের শ্যালিকা। বাঙালী সমাজে শ্যালিকা-ভগ্নীপতির মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই মিষ্টি-মধুর সম্পর্কের মধ্যে কখনো কখনো আদিম কামনা-বাসনা আবির্ভূত হয়ে দুটি চরিত্রের মধ্যে সৃষ্টি করে সম্পর্ক-জটিলতা। কুবেরের জীবনে কপিলা সেরকমই এক মূর্তিমহী বিগ্রহ। উপন্যাসের নায়ক কুবেরের আপাত বৈচিত্র্যহীন জীবনে পদ্মানদীর উত্তরঙ্গ প্রবাহের মত প্রচন্ড আবেগ ও কামনার তরঙ্গোচ্ছাস সৃষ্টি করেছে কপিলা। ছলনাময়ী কপিলার প্রতি কুবেরের আকর্ষণ আদিম প্রাণের বলিষ্ঠ কামনা ও নিষিদ্ধ পরকীয় প্রেমের বঙ্কিম-জটিল রহস্যের সংমিশ্রণ।

উপন্যাসের নায়ক কুবেরের জীবনে এসেছে দুই নারী-স্ত্রী মালা এবং শ্যালিকা কপিলা। কুবেরের সঙ্গে রহস্যময় সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্বে কপিলা ছিল স্বামী-পরিত্যক্তা (পরে স্বামী তাকে গ্রহণ করে)। মালা জন্ম-পঙ্গু। দিদির সংসারে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসে কপিলা কুবের মাঝির মনে নিষিদ্ধ প্রণয়ের ঢেউ তুলেছিল। রহস্যময়ী, প্রাণ-চঞ্চলা কপিলা নির্জন নদীরঘাটে কুবেরের জন্য পান-গুয়ার পরিবর্তে তামাক নিয়ে আসে; কুবেরের জীবনের চতুর্দিকে রচনা করে মোহিনী জাল। কুবের কপিলার দুই কাঁধ শক্ত করে ধরে বাঁশের কঞ্চির মত নমনীয় তার দেহকে পিছনে হেলিয়ে দেয়। নারী হিসেবে কপিলা ও মালার মধ্যে যে কত পার্থক্য মূহূর্তমধ্যে কুবের তা অনুভব করে-''মালা, যে কোনদিন ওঠে নাই, হাঁটে নাই, ঘুরিয়া বেড়াইয়া চারিদিকে জীবনকে ছড়াইয়া মেলিয়া রাখিতে পরে নাই, তার জন্য কুবেরের কোনদিন আফশোস ছিল না। গতি নাই বলিয়া মালার আবদ্ধ ঘনীভূত জীবন তারই বুকে উথলিয়া উঠিয়াছে....কিন্তু অন্ধকার রাতে তামাক পৌঁছাইয়া দিতে সে তো কোনদিন নদীতীরে ছুটিয়া আসিতে পারে না।....'' বস্তুতঃ কুবের-কপিলার যুক্তিতর্কহীন অবুঝ কামনা-বাসনার আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে আদিম মানুষের জৈবিক ধর্মেরই প্রকাশ ঘটেছে-এর মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জীবনের রোম্যান্টিক বিলাস দেখা যাবে না, ''জীবন-সংগ্রামে পোড়খাওয়া, আত্মরক্ষাসচেতন মানুষের হৃদয়ানুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে কুবের-কপিলার ঘনিষ্ঠতায়।''

কুবেরের জীবনে মালা ও কপিলা দুটি চারিত্রিকবৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। মালা বর্ষারহিত পদ্মার শান্ত-নিস্তরঙ্গ রূপ; কপিলা বর্ষার উত্তাল পদ্মানদী, দুরন্ত তার হাতছানি। পদ্মানদীর মাঝির জীবন যেন পদ্মার এই দ্বৈতরূপেই একটি পরিপূর্ণ বৃত্ত রচনা করে।

সব মিলিয়ে কুবেরের জীবনতটে পদ্মানদী, মালা, হোসেনমিয়া এবং কপিলার প্রভাব দূরবিস্তৃত

মোহনার মত রহস্য সঞ্চার করেছে। এই উপন্যাসে কুবের ভিন্ন অন্য চরিত্রে এত বিস্তৃতি আর চোখে পড়বে না। কুবের গোষ্ঠীজীবনের মূর্ত প্রতিভূচরিত্র; ব্যক্তিজীবনে তার সাংসারিক সত্তার সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য জৈবিক প্রবৃত্তির লীলা, অশিক্ষিত গ্রাম্য সারল্যের সঙ্গে বলিষ্ঠ আদিমতা-এ সমস্ত চরিত্রটির বহুমাত্রিকতার (Multidimensional) লক্ষণ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম দিকে কুবেরের উপস্থাপনা পদ্মানদী নির্ভর ধীবরগোষ্ঠীর শ্রেণীপ্রতিনিধিরূপে; কিন্তু উপন্যাস-ঘটনায় কপিলার আবির্ভাবের পর চরিত্রটি ক্রমশঃ ব্যক্তিগত জীবনের আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার দ্বন্দ্বসংঘাত ইত্যাদিতে কথিত-বিমথিত হয়ে তার শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনেকখানি হারিয়েছে।

টিপ্পনী

এছাড়া হোসেনমিয়ার সংস্পর্শে এলেই কুবের হয়ে পড়ে সংকুচিত ও ম্লানপ্রতিত। হোসেন মিয়ার প্রবল ব্যক্তিত্ব এ-উপন্যাসে কুবেরের নায়কত্বের মহিমাকে অনেকাংশেই আচ্ছন্ন করেছে।

পদ্মার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কুবের যখন দূর ময়নাদ্বীপে নতুন বসতি স্থাপনের জন্য যাত্রা করে, তখন উপন্যাসের নামকরণের যাথার্থ্য নিয়ে পাঠকের মনে একটি অনিবার্য প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সেই প্রশ্নটি হল-উপন্যাসটির নামকরণ কি পদ্মানদীর সমূহ মাঝিচরিত্র কেন্দ্রিক? নাকি বিশিষ্ট কোন মাঝি-চরিত্রের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী? কুবের চরিত্রের পরিণতি প্রসঙ্গটিই এরকম প্রশ্নের জন্ম দেয়।

মালা চরিত্রের পূর্ণতা, অপূর্ণতা

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মালা কেন্দ্রীয় চরিত্র না হলেও উপন্যাসের নায়ক কুবেরের জীবনে তার প্রভাব যথেষ্ট। মালা জন্মপঙ্গু। চরডাঙ্গার বৈকুণ্ঠের বহু সন্তানের একজন মালা। কুবের এই পঙ্গু মেয়েটির ভরপোষণের দায়িত্ব নিয়ে স্ত্রীরূপে তাকে ঘরে তুলেছিল-সুতরাং মালা সেদিক থেকে ভাগ্যবতী।

মালা পঙ্গু বলেই বর্হিজগতের সঙ্গে তার পরিচিতি নেই-অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ গৃহকোণ থেকেই সে তার কৌতুহলী দৃষ্টি ফেলে বাইরের জগতে। পায়ের নীচ থেকে অসার দেহটাকে হাতের উপর ভর দিয়ে কোনমতে টেনে নিয়ে যায় সে।

মালার সদ্যোজাত সন্তানকে ঘিরে মেজবাবু অনন্ত তালুকদারের সঙ্গে এক অবৌধ সম্পর্ক রচনা করে কল্পনাপ্রবণ গ্রামীণ নিন্দুকেরা। কুবের এতে প্রাথমিকভাবে অধৈর্য্য হলেও মালা সম্পর্কে শেষপর্যন্ত সে সন্দীহান হতে পারে না। মালা চরিত্রের এই বিশ্বস্ততাটুকু উপন্যাস-ঘটনায় অতি সংক্ষেপে কিন্তু শিল্পকুশলতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। মালার প্রতি একপ্রকার সম্ভ্রমবোধও আছে কুবেরের মনে। মালাকে তার কোন কোন সময় 'রাজরাণীর মত' মনে হয়। গৌরবর্ণা মালা সম্পর্কে তার সম্ভ্রমাত্মক ধারণা-'জেলেপাড়ার কোন স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নাই। একটা পা যদি ওর হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধূলা ঝাড়িতেও আসিত না।'

মালা সন্তানবৎসল। জেলেপাড়ার রমনীদের মত সন্তান-উদাসীন নয়। দিনের শেষে ক্লান্ত মলিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ে তোলে নিজস্ব জগৎ। দুরন্ত-বেপরোয়া শিশুরা মালার স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়ে নিতান্ত বাধ্য আচরণ করে। ভাষার অপরূপ কারুকার্যে তার মুখ থেকে বেরিয়ে

আসে অবাক-করা রূপকথার গল্প। মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে শোনে মালার গল্পগাথা, প্রতিবেশীদের কেউ কেউ মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়, কুবেরও হয়ে ওঠে সেই গল্পের সমাজদার শ্রোতা। রসিকা মালা 'আড়চোখে চাহিয়া কুবেরকে লজ্জা দিয়া.....আবার রূপকথা বলিতে থাকে।' গৃহবন্দী অন্তর্মুখী মালার সঙ্গে এমনি করেই সংসারের আর পাঁচজনের একটা সম্পর্ক -সেতু তৈরী হয়।

টিপ্পনী

মালা কোমলস্বভাবা নারী। শুধু নিজের সংসার নয়, পিত্রালয়ের প্রতিও তার মায়ামমতা অকৃত্রিম। প্রলয়ংকারী বন্যার দিনে তাই মালাই উদ্যোগী হয়ে কুবেরকে তার পিত্রালয় চরডাঙ্গায় পাঠায়। কুবের বিরক্ত হয়, কিন্তু মালার কথা অমান্য করতে পারে না। চরডাঙ্গা থেকে এই ঘটনার ফলশ্রুতিরূপেই ছোট ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে মালার সংসারে কপিলার অনুপ্রবেশ। মালার স্নেহাতিরেকের সৌজন্যেই সংসারক্ষেত্রে এরপর গ্রোথিত হয় বিষবৃক্ষের বীজ, উদ্গত হয় বিষবৃক্ষের অঙ্কুর, তারপর তা বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে বিষফল প্রদান করে, যে বিষফলের তীব্র বিষজ্বালায় মালার জীবন ও সংসার যন্ত্রণাকাতর হয়ে ওঠে। কপিলারূপ বিষবৃক্ষের উত্থানের জন্য মালার অজ্ঞানতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত অনেকটা দায়ী।

বস্তুতঃ প্রগল্‌ভা, সংস্কারমুক্তা, প্রাণচঞ্চলা ও প্রেমপিয়াসী কপিলার আগমনের পরই কুবেরের সংসারে মালার গুরুত্ব ক্রমহ্রাসমান হয়ে পড়ে। কুবের মালার মধ্যে স্থবির, বদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় জীবনাচরণগুলিকে আবিষ্কার করতে থাকে আর অন্য দিকে পদ্মার উত্তাল যৌবনশক্তির মত উচ্ছল কপিলার সংস্পর্শে ক্রমে তার মধ্যে জেগে ওঠে সুপ্ত কামনা-বাসনার অবাধ্য ঢেউ। মালা কুবেরের বিপথগামীতার কথা টের পায়, কিন্তু আত্মঅধিকার প্রতিষ্ঠা করার মত চারিত্রিক জোর তার ছিল না। আমিনপুরে কুবের-কপিলার একত্রে রাত্রিবাসের ঘটনাও তার অজানা নয়-কিন্তু মৌখিক ক্ষোভ প্রকাশ করেই তার স্বামীবিরোধিতার সমস্ত উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়।

মালার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে তার পঙ্গুত্বই সর্বাংশে দায়ী। কপিলার বেগবতী তরঙ্গময় জীবন হয়ত মালাকে তার বদ্ধ সংকীর্ণ অবস্থাটি সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন করে তুলেছিল। তাই আমিনবাড়ীর যে চিকিৎসক গোপীকে অনেকটা সুস্থ করে তুলেছিলেন, মালারও লোভ হয়েছিল তার চিকিৎসায় নিজের পঙ্গুত্ব যদি ঘোচানো যায়। কিন্তু চিকিৎসক তাকে নিরাশ করেন। মালা এই নৈরাশ্যের সংবাদ দিয়ে 'সজল কণ্ঠে বলে, ডাক্তর কয় পাও সারনের না আমার।' কুবেরের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে নাছোড় মালা মেজবাবুর সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিল বলে কুবের মালার প্রতি বিরক্তি ও ঔদাসীন্যই দেখিয়ে যায়, তখন সেই অন্তর্মুখী চরিত্র মালাই মুহূর্তের মধ্যে তার জীবনের অপূর্ণতা ও স্বামী হিসাবে তার প্রতি কুবেরের নিয়ত অবহেলাকে আক্রমণ করে বলে ওঠে-''ক্যান মাঝি ক্যান্, এথ গোসা ক্যান? কবে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউককা দিনের নাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান?'' এরপরই স্বামী-স্ত্রীর চূড়ান্ত গ্রাম্যকলহ এবং পরিণামে কুবের নিক্ষিপ্ত 'কলিকার' আগুনে মালার অগ্নিদগ্ধ অবস্থা। প্রায় বিবস্ত্র মালার লজ্জানিবারণার্থে এরপর কুবের 'নিজের একখানা কাপড় আনিয়া দিল মালাকে।''

অরক্ষণীয়া কণ্যা গোপীর বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়ার মত মাতৃসুলভ আচরণ মালার মধ্যে লক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পাত্র যুগলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকলেও দুর্ঘটনায় গোপীর পা জখম হলে মালা রামুর হাতেই কণ্যাসমর্পণকে শ্রেয় জ্ঞান করেছে। তবে আত্মমত প্রতিষ্ঠা

করার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা মালার কোনদিনই ছিল না–এ ব্যাপারে তাকে কুবেরের উপরই নির্ভরশীল হতে হয়েছে।

মালা জেলে রমণীদের মধ্যে ব্যতিক্রমী চরিত্র। দারিদ্র ও পঙ্গুত্ব তার চরিত্রের সদ্‌গুণগুলিকে বিকশিত হতে দেয়নি। অতিবাল্য থেকেই সে যন্ত্রণা ও অন্যের দেওয়া পীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্ত। বিবাহিত জীবনেও সে স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিতা হতে পারেনি। স্বামীর স্বপ্রেম সান্নিধ্য তার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, আপন সহোদরাও প্রতি নায়িকার মত তার স্বামীকে নিয়েছে ছিনিয়ে–অথচ মালা নির্দোষ চরিত্র, অনেকক্ষেত্রে গুণবতীও। এই রকম একটি চরিত্রকে শেষপর্যন্ত জীবনের বালুচরে নাবালক সন্তানদের নিয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। সংসার তার গুণপনার কোন মূল্য দেয়নি।

টিপ্পনী

শুধু স্বামী আর কপিলা নয়, মালার জীবনে হোসেন মিয়াও এক মূর্তিমান নিয়তি চরিত্র। হোসেন মিয়া জ্ঞানত কুবের–কপিলার ক্রমনৈকট্যের গোপন সংবাদ, সে এও জানত মালা–কুবেরের প্রায় স্থলিত দাম্পত্য সম্পর্কের কথা–এই সুযোগগুলিকে সদ্ব্যবহার করেছে সে। মালা কোনদিনই হোসেন মিয়ার প্রতিপক্ষ হতে পারবে না–এই সরল বিশ্বাসেই হোসেন মিয়া হয়ে উঠেছে মালার অন্যতম আততায়ী।

কপিলা–নারীজীবনের বিপরীত স্রোতের পথিক

জেলেপাড়ার জমাট বসতি, ঘন সন্নিবদ্ধ ভগ্ন–অর্ধভগ্ন অপরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি, সেখানকার অন্নাভাবী জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত দারিদ্রলাঞ্ছিত মেয়ে–পুরুষদের চিরন্তন একঘেয়ে গতানুগতিক জীবনযাত্রা, উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ ম্রিয়মান শিশুদের চলাফেরা, দু'একটা পালপার্বণে অর্ধমৃত জেলে সমাজের একটু বাড়তি নড়াচড়া, আলস্যে, নেশায় ও ভাগ্যের উপর শাপ–শাপান্ত করে নিজেদের অক্ষমতাকে আড়াল করার প্রতারক প্রয়াস–জেলেসমাজের এই বৈচিত্র্যহীন শাম্বুকগতির জীবনে কপিলা এক দুরন্ত ঘূর্ণি বাতাস, যার দোলায় উপন্যাসের চালচিত্রে ভাবগত, লয়গত ও প্রাত্যহিক জৈবনিক চিন্তার চেনা–ছন্দের আকস্মিক পালাবদল ঘটে যায়।

বাঙালী নারীর চিরন্তন কল্যাণী আদর্শের বিপরীত পথের কপিলা। ন্যায়, নৈতিকা, পতিব্রত্য বা সংসারক্ষেত্রে শর্তহীন আনুগত্যের আদর্শে চরিত্রটি বিচার্য নয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব–বিশ্লেষণের জটিল–কুটিল পথে ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রটিকে উপন্যাসের কক্ষপথে আবর্তিত করেছেন। তবে এদেশের সামাজিক অনুশাসনকে উপেক্ষা করে কপিলার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে একাধিক নারী চরিত্র চরিত্রহীনা বা পাপিষ্ঠা অভিধা লাভ করেছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তারা চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শৈবলিনী চরিত্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র বিনোদিনী চরিত্র নারীজীবনের 'চল্‌তি হাওয়ার পন্থী' নয়–এক্ষেত্রে তাদের স্রষ্টাগণ নিজ নিজ জীবনদর্শনের আলোকে তাদের কার্যাবলীর স্বাভাবিকত্ব বা অস্বাভাবিকত্ব নির্ধারণ করেছেন। নারীর স্বাধীনচিত্ততা বা স্বাধিকারবোধ যখন স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়েছে বা স্বাধিকার প্রমত্ততায় পর্যবসিত হয়েছে তখনই জীবনে অথবা উপন্যাসে সৃষ্ট হয়েছে দুরপণেয় সমস্যা। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কপিলা সেরকমই এক নারীচরিত্র, যার অভিঘাতে নারী সম্পর্কিত সংস্কারের প্রচলিত মূল্যবান ধূলিসাৎ হয়েছে। চরিত্রটি পাঠকের সামনে এমনই এক প্রশ্ন তুলেছে যাতে মনে হয়, নারী জীবনের পরিণাম পূর্বনির্দিষ্ট কোন শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, চরিত্রেরই নিরঙ্কুশ অধিকার আছে জীবনের বাসরে স্বয়ম্বরা হওয়ার। এক্ষেত্রে কপিলার সামাজিক অবস্থানটিও

তার পূর্বসূরীদের চেয়ে স্বতন্ত্র। কপিলা অভিজাত, মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি নয়। সামান্য অশিক্ষিত লোকসমাজের নগণ্যা নারী হয়েও জীবনের চেনা-ছকের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহিনী হয়ে উঠেছে। তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে কপিলার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কি তার আত্মস্বার্থপূরণের এক অমানবিক ঢাল নয়?

টিপ্পনী

উপন্যাস-অংশে কপিলার ব্যক্তিপরিচয় বল, সে পদ্মানদীর বিশিষ্ট মাঝি কুবেরের শ্যালিকা। মালা কুবেরের স্ত্রী-জন্মপঙ্গু সে। কুবের পঙ্গু মালাকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিল। দাম্পত্য জীবনে কুবের ও মালার নিতান্ত অসুখী জীবনের বৃত্তান্ত ঔপন্যাসিক প্রদান করেননি। বরং অসহায়া পঙ্গু নারীটির প্রতি তার একপ্রকার সহানুভূতিই ছিল, আর ছিল বাধ্য দাম্পত্যজীবন-যাপনের সুখস্মৃতি। তবুও মালার পঙ্গুত্ব কোন কোন সময়ে কুবেরের মনে তার সংসার-অঙ্গনে এক প্রাণচঞ্চলা নারীর সক্রিয় উপস্থিতির অভাববোধ্যক উস্‌কে দিয়েছে। এই অভাবপূরণের ফেরিওয়ালী হয়েই উপন্যাসঘটনায় কপিলার আবির্ভাব।

উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বন্যাবিধ্বস্ত চরডাঙ্গায় মালার অনুরোধে কুবের যায় শ্বশুরবাড়ির খোঁজখবর নিতে। উপন্যাস-ঘটনায় কপিলার প্রথম আর্বিভাব এই চতুর্থ পরিচ্ছেদেই। কপিলা তখন বিবাহিতা; পূর্ণযৌবনা নারী। এখানেই কুবের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে কপিলার দুরন্ত কৈশোরের চঞ্চল অবাধ্য ছবি। কপিলার বাপের বাড়িতে আসার কারণ সুখপ্রদ নয়। 'পোড়াকপাইল্যা' 'অলক্ষী' কপিলা সম্পন্ন গৃহস্থ শ্যামাদাসের সঙ্গে কলহ করে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, পরে সেখানে গেলেও সে প্রত্যাখ্যাতা হয়েছে, শুধু তাই নয়, শ্যামাদাস পুনরায় বিবাহ করেছে। কিন্তু কপিলা এমনই প্রাণবন্ত চরিত্র যে, সেই করুণ প্রত্যাখ্যানের বিষাদচিহ্ন তার বাহ্য-ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়নি। এইপর্বেই ছোট ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে কপিলার কেতুপুরে আগমন। কুবেরের অভাবী সংসারে এতগুলি মানুষের আগমন কুবেরের বিরক্তির কারণ কিন্তু খুব শীঘ্রই কুবের কপিলার অন্য এক রূপ দেখে, যে রূপের মধ্যে আছে বহ্নির উত্তাপ-কুবের ধীরে ধীরে মূঢ় বশীভূত পতঙ্গের মত সেই বহ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার উদ্যোগ করেছে। কপিলার রহস্যময় হাসি, অর্থহীন আচরণ, নদীর তীরে কুবেরকে তামাক পৌঁছে দেওয়া 'আমারে নিবা মাঝি লগে?'-এই প্রহেলিকাময় আবেদন কুবেরকে যেন তোলপাড় করে তোলে-কঞ্চির মত নমনীয় কপিলার দেহকে সবলে পিছনে হেলিয়ে দিয়ে সানুরাগ উচ্চারণ করে কুবের-'বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা।' কলহাস্যমখরা কপিলা কুবেরকে প্রশ্রয় দেয়, কাদায় লুটোপুটি খায়, ''হাসিতে হাসিতে বলে, আরে পুরুষ।'' এই প্রথম কুবেরের জীবনে কপিলা স্ত্রী মালার চেয়ে উষ্ণবর্তিনী হয়ে উঠল। কুবেরের মনে হল-''ভাঙ্গা চালার নীচে সঙ্কীর্ণ শয্যায় পঙ্গু মালার তুলনা জগতে নাই। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তামাক পৌঁছাইয়া দিতে সে তো কোনদিন নদীতীরে ছুটিয়া আসিতে পারেনা- বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য ভঙ্গিতে পারেনা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে।'' কামনার ছিদ্রপথে এমনি করেই কুবেরের মনের গভীরে কপিলার অনুপ্রবেশ ঘটে। ঘুমের আগেই এই কপিলা কুবেরের মনের আকাশে স্বপ্নের ইন্দ্রধনু রচনা করে।

কপিলা কুহকিনী। সর্বজনের মাঝখানে থেকেও তার চপলতা কমে না, ছোট-বড় সবার সামনে কুবেরের প্রতি তার ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দক্ষেপণ বা ইঙ্গিত তাকে দুঃসাহসিকতার ভূমিকায় উপনীত করে-কুবেরের মনের সিংহভাগ দখল করতে থাকে কপিলা। গোপীর আহত পায়ের চিকিৎসা উপলক্ষ্যে আমিনপুরের হাসপাতালে যাওয়া, কপিলার জেদাজেদিতে রাত্রে একই হোটেলে রাত্রিবাস কপিলার দুঃসাহসী চরিত্রের অনন্য দৃষ্টান্ত। বাপের বাড়ী ফেরার ব্যাপারে

কপিলার চরম অনাগ্রহ এবং শেষপর্যন্ত স্বামী শ্যামাদাসের দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হলে কপিলার স্বামীগৃহে প্রত্যাগমন ঘটে। কিন্তু কপিলার সঙ্গে এই দূরত্বসৃষ্টি কুবেরের জীবনকে বিস্বাদ করে তুলল। অবাঞ্ছিত অতিথি হিসাবে আকুরটাকুর গিয়ে কুবের অনুভব করল কপিলার শ্বশুর বাড়ির জীবন কি দুঃসহ। প্রাণচঞ্চলা স্বাধীনচেতা কপিলা সেখানে ''পরের ঘরের বৌ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই।'' বোঝা যায় শ্যামাদাস এমন এক অস্বচ্ছ দর্পণ যেখানে কপিলার ভরা-নারীত্ব কোন রমনীয় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে না। কুবের অনুভব করে কপিলা সুখে নেই।

কপিলা এমনই এক আশ্চর্য নারী যে স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজেনা-খোঁজে মনের মত একজন পুরুষ মানুষ। কুবেরের শত অভাব, হতশ্রী ঘরবাড়ি, অগোছালো জীবন-এসব সত্ত্বেও কপিলা কুবেরের মধ্যে এমন এক মন খুঁজে পেয়েছিল, যে মনে আচে আবেগ, আছে ভালোবাসার সূক্ষ উপলব্ধি-কপিলা তাই সব ন্যায়-অন্যায় বিসর্জন দিয়ে সবলে কুবেরকে আঁকড়ে ধরেছিল। কুবেরের প্রতি ভালোবাসার আকুতির ইঙ্গিতপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আকুরটাকুর গ্রামের এক বিষন্ন প্রভাতে-একান্ত কাটাকাটা সংলাপে। দোল উৎসব উপলক্ষ্যে কুবের আবার হাজির হয় চরডাঙ্গায়, কপিলার আগমনবার্তা শুনে। কপিলার দেহবিভমে ও পুকুরের জলে উত্তাল ঢেউ তোলার ভঙ্গীতে কপিলা বুঝিয়ে দেয় তার মনের প্রকৃত বার্তা। অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে কখনো সে বলে-''মনডার অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা কাহিল হইছি।''

গোপীর বিয়ে উপলক্ষে কপিলার কেতুপুরে আসা, মিথ্যে চুরির অপবাদে কুবেরের জেলে যাবার পরিস্থিতি তৈরী হওয়া এবং কুবেরকে চৌকিদারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিশুতি রাতে নদীর ঘাটে উপস্থিত হওয়া- এই রকম পর পর ঘটে-যাওয়া ঘটনা কপিলা ও কুবেরকে জীবনের সমতটে পৌঁছে দিয়েছে। কপিলা তখন পরকীয়া নায়িকার মত দুঃসাহসিনী। হোসেন মিয়া যখন কুবেরের ত্রাণকর্তা হিসেবে তার ময়নাদ্বীপে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে, কপিলাও তখন কুবেরের সহযাত্রিণী হয়ে জীবনের অকূল দরিয়ায় পাড়ি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। প্রগল্‌ভা চঞ্চলা কপিলা তখন শান্ত প্রণয়িনী, কোন বিদ্রূপ নয়, লঘু বাক্‌ভঙ্গী নয়; সংক্ষিপ্ত ঋজু ও আবেগহীন কণ্ঠে কুবেরের প্রতি তার একমাত্র আকুতি-'' আমারে নিবা মাঝি লগে?'' কুবের আপত্তি করে না- নতুন শিকড়ের সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়ে। কপিলা যেন দুরন্ত পদ্মা-সাগরসঙ্গম তার অনিবার্য গন্তব্য।

হোসেন মিয়া-'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের বহুমাত্রিক চরিত্র

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে এক দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়, জটিল চরিত্র হোসেন মিয়া। ধীবর-অধ্যূষিত গ্রাম কেতুপুরের ধীবরদের কাছে হোসেন মিয়া 'মুসকিল আশান' কিন্তু সেই 'মুসকিল আশান' চরিত্রের অন্তরালে কোন্ গোপন, ক্রূর চক্রান্ত বা অভিসন্ধি সে পোষণ করে, তা কেউ জানে না-তবু হোসনকে সবাই মান্য করে-শ্রদ্ধাভাব যেটুকু দেখায় তা ভয়ে। উপন্যাস-অংশে হোসেনের প্রথম আবির্ভাব দৃশ্যেই কুবেরের ভাবনায় সেই আশংকিত ভাবটি ধরা পড়ে এইভাবে, ''..... লোকটার আবির্ভাবে চিরদিন দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কা তাহাকে অস্বস্তি বোধ করায়।'' লেখকের ভাষায়, 'একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া।''

কেতুপুর গ্রামের সঙ্গে সে জড়িত, কিন্তু কেতুপুরের স্থায়ী বাসিন্দা সে নয়। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যায়-আবার ফিরে আসে দীর্ঘ কালান্তরে। আপাত দৃষ্টিতে চরিত্রটির

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মধ্যে ফিউডাল মেজাজ বা সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে,-জমিদারিসুলভ লোকনিয়ন্ত্রণের কৌশলী মনোভাব আছে, আবার আছে কেতুপুর গ্রামের গরীব অসহায় ধীবর পরিবারের সঙ্গে অবলীলায় মিশে যাওয়ার ক্ষমতা। তখন হোসেন মিয়া মস্ত ধনী বা রহস্যময় ব্যবসায়ী নয়, ধীবরজীবনের যেন আত্মার আত্মীয়। হোসেন মিয়ার জীবনের আকস্মিক উত্থান এতই অবিশ্বাস্য যে, সমগ্র কেতুপুর গ্রাম ও পারিপার্শ্বিক জনপদ তাকে সন্দিগ্ধ চোখে পর্যবেক্ষণ করে। হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধতা করার দুঃসাহস যেমন কেউ দেখায় না, তেমনি তাকে নিঃস্বার্থ জনদরদী বলেও কেউ বিশ্বাস করে না। হোসেন মিয়া অতি ভয়ংকর ঘটনাও ঘটায় অত্যন্ত শান্ত মস্তিষ্কে-''লালচে রঙের দাড়ির ফাঁকে সব সময়েই সে মিষ্টি করিয়া হাসে।'' অনুগতের প্রতি সে বন্ধুভাবাপন্ন, সহানুভূতিশীল এবং দরাজ-দিল, কিন্তু ''যে শত্রু, যে তাহার ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নির্মমভাবে দেয়, কিন্তু তাহাকে কেহ কোনদিন রাগ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না।'' হোসেন মিয়ার ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমতার এই সর্বভেদী শক্তি চরিত্রটির কঠোর সংগ্রামস্পৃহা, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার একনিষ্ঠ লক্ষ্য মুখীনতা এবং ক্লান্তিহীন অধ্যবসায় থেকে অর্জিত। কেতুপুর গ্রামে নোয়াখালি থেকে যখন তার প্রথম আগমন ঘটেছিল তখন সে ছিল ছেঁড়া লুঙ্গি-পরিহিত, রুক্ষ কেশ, গায়ে খড়ি ওঠা এক সাধারণ নিরালম্ব মাঝি। সেদিন সে ছিল পরাশ্রিত-পরের নৌকায় সে বৈঠা বাইত।-'' আজ সে তাহার বেঁটে-খাটো-তৈল-চিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাওলা পাঞ্জাবীতে ঢাকিয়া রাখে, নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়।'' শরীরের নধরতা তার আসল বয়সকে গোপন করে, পাকা চুলে লাগায় কলপ, 'নুরে' লাগায় মেহেদী রঙ, আর কানে গুঁজে রাখে আতরমাখানো তুলো। সমৃদ্ধির এই ভরা জোয়ারের মধ্যে ''গত বছর নিকা করিয়া ঘরে আসিয়াছে দু নম্বর স্ত্রীকে।'' কিন্তু এইসব সুখের ব্যবস্থা সে যে কী উপায়ে করিয়াছে গ্রামের লোক ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য নতুন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে।'' এইসব কারণেই হোসেন মিয়ার সঙ্গে গ্রামীণ সাধারণ মানুষদের একটি মানসিক দূরত্ব রচিত হয়।

কিন্তু হোসেন মিয়া স্বভাবে ধূর্ত, ক্রূর, ছলে-বলে-কৌশলে আপন উদ্দেশ্য সাধনে স্থিরলক্ষ্য। কেতুপুর গ্রামের জমিদার মেজবাবু জেলেজীবনের দৈন্য ও অসহায়তা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু আভিজাত্যের অহংকে দূরে সরিয়ে রেখে মাঝি-মাল্লাদের কাছে নিজের শ্রেণীদূরত্বকে মুছে ফেলতে পারেননি- সাধারণের চোখে মেজোবাবুর এই প্রয়াস তাই বড়লোকের খেয়ালীবিলাস বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, নিন্দুকজনেরা বলেছিল,'' জেলেপাড়া মেজবাবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ।'' কিন্তু হোসেন মিয়া ভিন্ন পথের পথিক। গ্রামের মানুষের কাছে তার আদি পরিচয় মাঝি হিসেবে; সুচতুর হোসেন মিয়া মাঝিত্বের সেই পূর্বপরিচয়কে মূলধন করে জেলেপাড়ার আপনজন হয়ে উঠতে চেয়েছে এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছে। কুবের, রাসু, গণেশ কারও সঙ্গেই সে শ্রেণীদূরত্ব রচনা করে না-সবাইকে সে 'বাই' সম্বোধন করে, কুশল বিনিময় করে এবং কৃত্রিম আবেগে বুকে হাত দিয়ে বলে ''জান দিয়া তোমাগো দরদ করি।'' সযত্নে পাতা শোভন শয্যায় যেমন হোসেনের শয়ন করার অভ্যাস আছে, তেমনি কুবেরের বাসগৃহের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মেঝেতে পাতা সামান্য চাটাইয়ের উপর অভুক্ত অবস্থাতেই অবলীলায় সুখনিদ্রা যাওয়ার ব্যাপারেও তার কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বা ছুঁতমার্গ নেই। ভাঙা-কুটীরের দাওয়ায় বসে দা-কাটা তামাকের সুখটান যেমন সে দেয় সপার্ষদ, তেমনি পরোপকারীর মহত্ত্ব নিয়ে কুবেরের ফুটো চাল মেরামতের জন্য শনের যোগান দেয়, স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কুবের-কণ্যা গোপীকে 'বিবিজান' সম্বোধন করে। মালা শরীরে পঙ্গু, সামান্য ছুঁচের জন্য সে হোসেনের উপর নির্ভর করতেই পারে কিন্তু সমগ্র

জেলে সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে আজন্ম পঙ্গু-হোসেন মিয়া ব্যাধির মূল কোথায় জানে, তাই সে পরোপকারের নামে কখনো শণ, কখনো অর্থ, কখনও 'খতের' বিনিময়ে বাসগৃহ নির্মাণের উপকরণ যোগান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিঃশর্ত লগ্নী করে চলে-এই লগ্নী তাৎক্ষণিক লাভের আশায় নয়, দীর্ঘমেয়াদী 'ফয়দা' অর্জনের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে। কারণ হোসেন মিয়ার কার্যধারার মধ্যে দূরদৃষ্টি এতই প্রবল যে, ''সে যা ঘটায় তা সমস্তই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী।'' আমিনুদ্দিকে ময়নাদ্বীপে স্থানান্তরিত করার যে অভূতপূর্ব কৌশল সে নিয়েছে তাতে আমিনুদিদ জানে হোসেনের জাল ছিঁড়ে তার পালানোর সামান্যতম উপায় নেই, আর হোসেন মিয়াও নিশ্চিত, বিপত্নীক আমিনুদ্দিনছিবলের সঙ্গে নতুন সংসার পাতার স্বপ্নে এমন বিভোর যে ময়নাদ্বীপই তার সুনিশ্চিত গন্তব্য। তাই হোসেন মিয়া ভালোমানুষির অভিনয় করে সবার কাছে নিজের মহত্ব প্রকাশ করে বলে-'' ফিরনের মন থাকলি কও মিয়া অখন, জাহাজে তুইল্যা দিই তোমারে কাইল। খুশ না হলি ক্যান যাবা?'' হোসেনের উদারতায় তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ''আমিনুদ্দি মাথা নাড়ে।''

হোসেন মিয়ার সর্বসত্তা নির্মোহ নির্মম পেশাদারিত্বে মোড়া। ব্যবসায়িক কার্যপরিচালনায় সে শৃগালের মত ধূর্ত। আত্মশক্তি, আত্মবুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই চরিত্রটি কোন কোন দিক থেকে চন্দ্রগুপ্ত-অমাত্য চাণক্যের মত তীক্ষধী। চাণক্য বলেছিলেন যখন পানীয়ে বিষ মেশানো হচ্ছে তখন প্রতিপক্ষকে আলাপে মোহিত করতে হবে, যখন ছুরিতে শান দেওয়া হচ্ছে তখন মুখে মৃদু হাসি রাখতে হবে। হোসেন মিয়ার কার্যকলাপে নির্দয় অভিসন্ধি ও অভিনয়পটুত্বে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

হোসেন মিয়ার ব্যবসায়িক কার্যকলাপ রহস্যময়তায় পরিপূর্ণ। পদ্মায় মাছ ধরা, গোরু-ছাগল থেকে শুরু করে মানুষ নিয়ে কারবার, বে-আইনি আফিম পাচার সব রকমের ব্যবসায় তার দক্ষতা অভূতপূর্ব। জলপথে হোসেন মিয়া আফিমের কারবার পছন্দ করে, কারণ জলপথেই এ ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। উপন্যাস-ঘটনায় আফিম-পাচারের সময় জল-পুলিশের উপস্থিত্তি বিষয়টি হোসেন মিয়া জানতে পারলে তার নির্বিকার উক্তিতে সেই দূরদর্শিতার বিষয়টি ধরা পড়ে। কুবেরের সঙ্গে তার ব্যবহার ও বাক্যালাপের পরিচয়টি দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন-

> ''কুবের বিষন্নমুখে হোসেন মিয়ার কাছে যায়। ফিসফিস করিয়া বলে,
> পুলিশ লল্‌চো আছে মিয়া সাব।
> হোসেন মৃদু মৃদু হাসে, বলে বৈঠা ধর গিয়া কুবির বাই। হোসেন মিয়া থাকতি
> কারে ডরাও? নদীর মধ্যে জাল ফেলাইয়া মাল উঠাইবে কোন্ হালার পুত?''

ধূর্ততায়, বুদ্ধিতে, ধৈর্যে, অধ্যবসায়ে, নিষ্ঠায় হোসেনমিয়া অতুলনীয়; কুবেরের মূল্যায়নে ''কী প্রতিভা লোকটার, কী মনের জোর; .....'' কুবের শুধু ব্যবসায়ী নয়, স্বপ্নপ্রেমিক এবং স্বভাবকবি। ভাবের গভীর থেকে তার কবিত্বের বাণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে, মন যখন খুশীতে ভরে ওঠে তখন সে গান বাঁধে, হোসেন বলে, ''খুশ হলি না পারি কী?'' বর্ষাক্লান্ত রাত্রে কুবেরের জীর্ণ কুটীরের স্যাঁৎসেতে মেঝেয় ছিন্ন চাটাইয়ে সুখনিদ্রা দিয়ে কোন এক অজ্ঞাত কারণে হোসেন মিয়ার মন খুশীতে ভরে ওঠে, আর গান বাঁধে-

> ''আঁধার রাইতে আসমান জমিন ফারাক কইরা থোও
> বোনধু কত ঘুমাইবা।

টিপ্পনী

বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল এমন রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।.....
নিদ্ ভাথে না, ছিল জাগে না, বিবির বুকের শির
পাড়ি দিবাব সময় গেল, মাঝি তবু থির-
মাঝি কত ঘুমাইবা।''

টিপ্পনী

হোসেন মিয়ার স্বভাব-কবিত্ব থেকে সৃষ্ট এই গানে চরিত্রটির সমগ্র জীবনদর্শন যেন মূহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাজের মানুষ হোসেন মিয়া। তার জীবন-অভিধানে 'আলস্য' শব্দটি অনুপস্থিত। তার গানের ধুয়াপদে তাই বারবার ঘুরে ঘুরে আসে-'বোনধু কত ঘুমাইয়া', 'মিয়া কত ঘুমাইবা' কিংবা 'মাঝি কত ঘুমাইবা'। জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্ন রোম্যান্টিকতার পাখায় ভর করে হোসেন মিয়ার গানে বাণীরূপ পায় এইভাবে-''মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি,/ উঠ্যা দেখবা না।''-সময়ের অপচয় নয়, সময়ের বুকে ঘটে-যাওয়া ঘটনার সাক্ষী হতে চায় সে, তার ভেতরেই সে খোঁজে জীবনের সৌন্দর্য, ঠিক যেমন মানের পাতায় রাত্রির শিশির কিন্তু সকালের সূর্যালোকে প্রদীপ-শিখার মত চক্‌চক্ করে।

হোসেন মিয়া শুধু মাঝি নয়, ব্যবসায়ী নয় কিংবা ভোগী সংসারী নয়-তার জীবনের একতম লক্ষ্য হল ময়নাদ্বীপে মানুষের এক নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলা। দিগন্তবিস্তারী ধূ ধূ নোনাজলের বুকে এগার-মাইল বিস্তার ঘন অরণ্যবেষ্টিত সর্পসঙ্কুল ও বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ পরিপূর্ণ ময়নাদ্বীপে মানুষ্য কোলাহলে ভরিয়ে দিতে চেয়েছিল। স্বোপার্জিত অর্থে সে গড়ে তুলতে চেয়েছিল সেই মানুষদের মাথায় বসবাসের ছাদ, যোগাতে চেয়েছিল প্রতিদিনের অন্ন-পান, বন্ধ্যা মাটির বুকে ফলাতে চেয়েছিল স্বর্ণফসল। এর জন্য তার যত ছলচাতুরী, ভালোমানুষীর অভিনয়, পরোপকারীর ছদ্মবেশ ধারণ। কেতুপুর এবং সংলগ্ন অঞ্চলের অসহায় মানুষদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং তাদের অভাবী ফ্যাকাসে দৃষ্টির সামনে শতেক প্রলোভনের ইন্দ্রজাল রচনা করে সে তাদের একে একে নিয়ে গিয়েছে পান্ডববর্জিত দেশ ময়নাদ্বীপে। হোসেন মিয়া বাস্তববাদী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্বার্থসচেতন। ময়নাদ্বীপে যে-কোন মানুষ তার আকাঙ্খিত নয়, কেবল সন্তানউৎপাদনক্ষম মানুষদেরই সে সেখানকার যোগ্যমানুষ মনে করে। সেজন্য বৃদ্ধ বসিরকে ফিরে আসতে হয় যুবক এনায়েতের হাতে যুবতী স্ত্রীকে তুলে দিয়ে, নজিবনের নিকার পর রসুলও স্থান পায় না ময়নাদ্বীপে কিংবা হোসেন মিয়া কুবেরকে একাকী ময়নাদ্বীপে আমন্ত্রণ জানায়না, তার গূঢ় চক্রান্তের অভিকর্ষীয় শক্তিতে শেষপর্যন্ত কপিলাকেও যেতে হয় সেখানে-কুবেরের সন্তানধারণের সহযোগী হিসেবে। একাজ নৈতিক না অনৈতিক, উচিত না অনুচিত-তা হোসেন মিয়ার কাছে বিচার্য নয়।

হোসেন মিয়া আসলে কেতুপুরের ধীবর-সম্প্রদায়ের জীবনে নিয়তি স্বরূপ, তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা। হোসেন মিয়া যা ইচ্ছা করে, তার বাস্তবায়ন ঘটেই। জেলে সমাজ তাই হোসেন মিয়াকে মনে করে অতিমানব। হোসেন মিয়ার ক্ষমতা অসাধারণ-প্রতিভা তার সর্বদিকে। সে যেমন দক্ষ মাঝি। তেমনি স্বভাবকবি। আবার যখন অকূল সমুদ্রের বুকে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলা দরকার বলে মনে করে তখন সে সাহেব ক্যাপ্টেনের কাছে বাধ্য ছাত্রের মত শিখে নেয় কম্পাস ব্যবহারবিদ্যা। সে চায়, কেউ যেন তাকে এই অনুযোগ নিয়ে প্রশ্ন না করে-''মাঝি কত ঘুমাইবা।'' হোসেন মিয়া ক্লান্তিহীন কর্মী;-আপন ভাগ্যের নির্মাতা, অন্যের ভাগ্যেরও। তাই শেষ পর্যন্ত সে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নিয়ন্ত্রক শক্তি।

উপন্যাসের সঙ্গীত ও ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায়

টিপ্পনী

উচ্ছল জলস্রোতে নৌকা ভাসিয়ে জেলে-মাঝিরা যখন দূরদেশে পাড়ি দেয়, পিছনে পড়ে থাকে ঘর-সংসার-স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয় পরিজন আর মনের মধ্যে উঁকি দেয় নতুন গন্তব্যের নানান স্বপ্ন-ছবি, তখনই মাঝি-মাল্লার কণ্ঠে হৃদয়ের কতশত ভাব গানের ঝরণাধারা হয়ে ঝরে পড়ে। পল্লীগীতি-ভাটিয়ালী বা ভাওয়াইয়া গানের স্বভাব কবিত্বে জীবন্ত হয়ে ওঠে নিরক্ষর দরিদ্র অথচ প্রেমিক মানুষদের অন্তস্থল। 'পদ্মানদীর মাঝি' নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। পদ্মার বুকে 'নাও' ভাসিয়ে জেলে মাঝিরা গানকে উপেক্ষা করবে এটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। সেজন্যই পদ্মানদীর মাঝিতে ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক গানের অবতারণা করেছেন।

স্থূল সংলাপে কিংবা কাব্যিক বর্ণনায় যখন কোন জটিল বা রহস্যময়ী পরিস্থিতির যথাযথ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না, ভাষা যেখানে অর্থের দ্বারোন্মোচন করতে পারে না, সেখানে কথা ও সুরের মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট সঙ্গীত অব্যক্ত অর্থকে অনাবৃত করে দেয়, রবীন্দ্রনাথও তাই বলেন, 'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।' পদ্মানদীর মাঝিতে ব্যবহৃত তিনটি গান উপন্যাসের অন্তর্গত কোন দুর্মোচ্য পরিস্থিতি বা চরিত্রের সঙ্গে লগ্ন কোন জটিল বৈশিষ্ট্যের উন্মোচক রূপে কাজ করেছে। এখানে তিনটি গানের মধ্যে দুটি গণেশের কণ্ঠে গীত-দুটিই প্রচলিত সঙ্গীত এবং অবশিষ্ট গানটি হোসেন মিয়ার কণ্ঠে গীত, সেটি তার স্বরচিত। ক্রমানুসারে উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে গণেশের গান, তৃতীয় পরিচ্ছেদে হোসেন মিয়ার গান এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে আবার গণেশের গান প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে গীত গণেশের গানটির মূলরূপ উপন্যাসে উল্লিখিত হয়নি। পরের নৌকায় দিনমজুর খেটে পদ্মানদীর দুঃখী মাঝি কুবের-গণেশের দিনাতিপাত হয়। শারীরিক অসুস্থতা, দুঃখ-কষ্ট মহাজনের কাছে ধর্তব্যই নয়। দুঃখের বারোমাস্যায় কুবের গণেশদের দিন কেটে যায়। এরকমই একটি দিনে গণেশ নিজেই গান ধরে। সেই গানের মুখ্য বক্তব্যটুকুই ঔপন্যাসিক কাহিনী অংশে তুলে ধরেছেন নিজের ভাষায়। গণেশের গীত গান ধনঞ্জয় ও কুবের অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শোনে। গানটির বক্তব্য-''যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ নয়।'' কোন ব্যক্তিবিশেষের সমস্যা নয়, গানটির মদ্যে জাগতিক সব মানুষের জীবনের একটি মৌল সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের সূচনা অংশেই গণেশের এই গানে কুবেরের ভবিষ্যৎ জীবন কোন এক রহস্যময় ইঙ্গিতের 'চকিত চমকে চমকিত' হয়ে উঠেছে।

হোসেন মিয়ার নৌকায় নতুন কাজে যোগ দিয়ে চিরকালের হাবাগোবা গণেশ এমনই আচরণ করেছিল যা তার চিরকালের স্বভাববিরুদ্ধ। যে গণেশ চিরকাল কুবেরকে ভয় পেয়ে এসেছে, মান্য করে গিয়েছে, সেই গণেশই নৌকায় হোসেন মিয়ার লোকজনের সঙ্গে মিসে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে কুবেরকে নিয়ে কৌতুক করেছে এবং কখনো কখনো অবাধ্য হয়েও উঠেছে। এমনকি কুবেরের অনুমতি ছাড়াই শম্ভু ও বগার সঙ্গে শহরে রাত কাটিয়ে সকালে নৌকায় ফিরেছে। চিরকালের অনুগত গণেশের সেই আচরণে কুবের ক্ষুব্ধ হয়ে তার সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ করেছে। শেষপর্যন্ত নৌকা থেকে নেমে বাড়ি পৌঁছে কুবের জানতে পারে গণেশ গতরাতে 'বাক্য মাইয়ার' গীত শোনাতে মগ্ন ছিল। উপযাচক হয়ে সেই গান সে কুবেরকে শুনিয়েছে-

পীড়িত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই।

আগুন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দই!
আ লো সই!
থাকিল ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির নলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ান ভাইজা করে খৈ।
আ লো সই!
এই গান শুনে ক্ষুব্ধ কুবের গণেশকে বলে-'' কুচরিত্তির হইছস, আই?''
গণেশ প্রত্যয়ী উত্তর দেয়-''গীত শোননে দোষ নাই।''

টিপ্পনী

বস্তুতঃ গণেশের এই গীত গানটি কুবেরের জীবনে সতর্কীকরণ সংকেত বিশেষ। কুবের-কপিলার অবৈধ সম্পর্ক, কুবেরের মনোকষ্ট এবং ভালোবাসার মানুষের জন্য সর্বক্ষণ অশান্তিভোগ ইত্যাদি বিষয় এই গানটির মধ্যে একটি বিশেষ ব্যঞ্জনাবাহী সত্য হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু গণেশ পীরিতির এই অকারণ জ্বালাভোগের পক্ষপাতী নয়। ঐ জীবনের সঙ্গে সে যে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে চায়, তার 'গীত শোননে দোষ নাই' ইত্যাদি উক্তির মধ্যে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুবেরের স্ত্রী মালা পুনরায় ঐ গানটি শুনতে চায়, অর্থাৎ মালার অভিপ্রায়, ঐ গানের মাধ্যমে কুবেরকে আত্মসংযমী হওয়ার বার্তা পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং গণেশের এই গানটি নিছক পদ্মানদীর এক নগন্য মাঝির খামখেয়ালি সঙ্গীতচর্চা নয়।

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হোসেন মিয়ার নিজের রচিত ও সুরারোপিত গানটি চরিত্রটির স্বভাব ও প্রকৃতির মৌলিক স্বরূপটি চিনিয়ে দেয়। 'খুশি হলি না পারিকী?'-হোসেন মিয়ার এই প্রত্যয়ী উচ্চারণের পিছনে চরিত্রটির আত্মবিশ্বাস ও গভীর জীবনাদর্শনের পরিচয় লুকিয়ে আছে। হোসেন মিয়ার খুশির পিছনে কোন আড়ম্বরপূর্ণ কারণ নেই। বর্ষণমুখর রাত্রে কুবেরের ভাঙ্গা ঘরের স্যাঁতসেতে মেঝেয় চাটাইয়ের উপর শুয়ে নিদ্রা গিয়ে খুশীর কোন্ অলৌকিক উপকরণ সে খুঁজে পেয়েছিল তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত কিন্তু তার গান থেকে বোঝা যায় কর্মবিমুখতা, আলস্য, সময়ের অপচয় এবং অকারণ আরাম উপভোগ তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। তাই নিজের কাছে এবং অলস-অকর্মণ্য মানুষগুলির কাছে তার প্রশ্ন 'বোনধু কত ঘুমাইবা', 'মিয়া কত ঘুমাইবা' কিংবা 'মাঝি কত ঘুমাইবা'। জীবনের কালক্ষেপণ শুধু পার্থিব প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়, জীবনের সৌন্দর্য উপভোগেরও প্রয়োজন আছে সেখানে। হোসেন মিয়ার রোম্যান্টিক কবি-কল্পনায় তার অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে-''মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি/ উঠ্যা দেখবা না।'-মানকচুর তৈলাক্ত পাতায় রাতের শিশির প্রভাতের সূর্যকিরণে যেন জ্বেলেছে রুপোলি আলোকশিখা-হোসেন মিয়ার এই কল্পনা একজন প্রকৃত কবির কল্পনা। হোসেনের জীবনপথ দীর্ঘ, তার স্বপ্নের বহর দীর্ঘতর-তাই ইংরেজকবির মত সে ও যেন বলতে চায়- 'And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep'-'বন্ধু কত ঘুমাইবা'।

পদ্মানদীর মাঝি-কাহিনীর নির্মাণ

নির্মোহ ও বস্তুবাদী জীবনবীক্ষণ,নিরাবেগ বর্ণনারীতি, মিতকথন, ভাষা ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে চরম লক্ষ্যমুখীনতা এবং চরিত্রের অন্তর্মূল দর্শনের বিরল প্রতিভা দিয়ে রচিত হয়েছে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতিদীর্ঘ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'। সর্বমোট সাতটি পরিচ্ছেদে বিভাজিত

উপন্যাসটি। পরিচ্ছেদ-মধ্যে সপ্তম বা অন্তিম পরিচ্ছেদটি দীর্ঘতম। এখানকার ঘটনা পটভূমি পদ্মার তীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চল-কেতুপুর, চরডাঙ্গা, আমিনবাড়ী, আকুরটাকুর এবং পদ্মানদী থেকে বিচ্ছিন্ন সমুদ্রদ্বীপ ময়নাদ্বীপ।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের ঘটনার সূত্রপাত বর্ষাঋতুর মাঝামাঝি পদ্মার ভরা-বুকে ইলিশ মাছ ধরার ঘটনা বর্ণনায় ও সেইসূত্রে পদ্মা-আশ্রিত ধীবর সম্প্রদায়ের আর্থিক দুরবস্থার বাস্তব চিত্রণে আর উপন্যাসের সমাপ্তি পদ্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ্মানদীর বিশিষ্ট মাঝি ও উপন্যাসের নায়কচরিত্র কুবেরের সুদূর ময়নাদ্বীপ যাত্রায়। এর মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে জেলেপাড়ার মানুষদের অশেষ দুঃখভোগের চিত্র, মালা-কপিলা-কুবেরের ব্যক্তিজীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক ছেদন ও নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার বাস্তব ও আদিম চিত্তপ্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশের ইতিবৃত্ত।

টিপ্পনী

'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাস। একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের পটভূমি আঞ্চলিক উপন্যাসে ঘটনাপরম্পরাকে ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ সীমাসংহতি অটুট রাখা আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু এই উপন্যাসের কাহিনী বা ঘটনা নির্ধারিত পটভূমির সীমা অতিক্রম করে ভিন্ন এক পটভূমি ময়নাদ্বীপকেও আশ্রয় করেছে। তাই অনেক সমালোচকের মতে এতে উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় ঐক্য অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে।

স্থানগত ঐক্যের (Unity of Place) বিচ্যুতি ঘটলেও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কালগত ঐক্যের (Unity of Time) দিকটি অত্যন্ত সুচারুভাবে রক্ষিত হয়েছে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই পাঁচটি ঋতুকে কেন্দ্র করে এক বছরের কম কালসীমার মধ্যে এই উপন্যাসে যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কিছু না কিছু ছাপ উপন্যাসধৃত ঘটনা ও চরিত্রের উপর মুদ্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির চালচিত্রেরও যে পরিবর্তন ঘটেছে, সে ব্যাপারেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন লেখনী চালনা করেছেন।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও সংহত। তবে কুবের-কেন্দ্রিক একক কাহিনীর পরিবর্তে ঔপন্যাসিক এখানে কিছু বিচ্ছিন্ন ও শিথিল কাহিনীরও অবতারণা করেছেন, যেগুলির দ্বারা পদ্মানির্ভর জেলেসমাজের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে। রাসুর কাহিনী, যুগী গণেশ বা আমিনুদ্দিপ্রসঙ্গ, শ্যামাদাস প্রসঙ্গ, পীতম মাসির বৃত্তান্ত ইত্যাদি নানা ঘটনা ও চরিত্র মূল ঘটনায় যথেষ্ট সাবলীলভাবে ঠাঁই পেয়েছে। তবে উপন্যাস-ঘটনায় সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গটি। শেষপর্যন্ত হোসেন মিয়াই পদ্মা-আশ্রিত অসহায় মানুষগুলির জীবনের নিয়ন্তক শক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে, কুবেরও বাধ্য হয়েছে হোসেন মিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। অন্যদিকে 'ময়নাদ্বীপ' অচেতন ভূখন্ড হয়েও পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনে উপন্যাসের আদ্যন্ত এক ভয়ংকর ত্রাস ছড়িয়েছে; ফলতঃ সে-ও অনিবার্যভাবে অর্জন করেছে এক অভিনব চারিত্রিক মাত্রা।

পদ্মানদীর মাঝি-ভাষা পরিচয়

সাহিত্যের যে-সমস্ত প্রচলিত আঙ্গিক আছে, তাদের প্রত্যেকটিরই ভাষারীতি এবং প্রয়োগবিধি পৃথক। কবিতার ভাষা ও ছোটগল্পের ভাষা কিংবা উপন্যাসের ভাষা ও প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে একরূপতা থাকে না। আবার একই সাহিত্য-আঙ্গিক এক এক জন রচয়িতার ব্যক্তিগত মানসিকতা,

শিল্পবোধ ও ভাষাজ্ঞানের নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে। এমনকি একই রচয়িতার ভাষারীতির মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় রচনাটির বিষয়বস্তু বা বর্ণিতব্য বিষয়ের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে। একজন ঔপন্যাসিক যখন কোনো রোমান্সধর্মী উপন্যাস লেখেন তখন সেটির যে ভাষারীতি, সেই ঔপন্যাসিকেরই রচিত একটি মনস্তত্ত্বনির্ভর উপন্যাসের ভাষারীতি সমপর্যায়ভুক্ত নয়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি'এই উপন্যাসত্রয়ে ব্যবহৃত ভাষা নিশ্চিতভাবে উপন্যাসের বিষয়বস্তু, পরিবেশ-পরিস্থিতি, চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেই সৃষ্ট হয়েছে-ফলতঃ ভাষাগত ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সেখানে দৃষ্ট হতেই পারে।

টিপ্পনী

উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থাকে। প্রথমতঃ যে পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে ঘটনা ঘটে তার বর্ণনা; দ্বিতীয়তঃ উপন্যাসধৃত চরিত্রের বিভিন্ন আচার-আচরণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ বিশেষতঃ চরিত্রের মনোজাগতিক নানা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান এবং অনুচ্চারিত সংলাপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়সাধন করা এবং তৃতীয়তঃ চরিত্রের মুখে ভাষা বা সংলাপ সংযোজন।

পদ্মানদীর মাঝি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস।একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঐ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিচয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি চিত্রায়ণ, উৎসব-অনুষ্ঠানের আঞ্চলিক বিশেষত্ব এবং সর্বোপরি সেখানকার ভাষা বা উপভাষাকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলার সদিচ্ছা আঞ্চলিক উপন্যাসে পরিদৃষ্ট হয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের ধীবরশ্রেণীর যে হতশ্রী অবস্থাকে বর্ষা থেকে বসন্ত এই পাঁচটি ঋতুর অনুষঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা-ব্যবহার কতখানে সাফল্য অর্জন করেছে তা এখন আমাদের বিচার্য।

আলোচ্য উপন্যাসে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষার দুটি রীতিই ব্যবহার করেছেন। রীতি দুটি হল সাধুরীতি ও চলিত রীতি। সংলাপ ব্যতিরেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ওখানে সাধুরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন আর চরিত্রের মুখের ভাষায় তিনি চলিত রীতির সাহায্য নিয়েছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি' যখন লিখিত হয়েছে তখন বাংলা উপন্যাসে আনুপূর্বিক চলিত ভাষারীতিকে অনেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষার মিশ্ররীতিকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, ভাষার যে রীতিই এখানে ব্যবহৃত হোক না কেন, সবক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক ভাষার একটি নির্দিষ্ট মান ও প্রকৃতিকে অবিকৃত রেখেছেন।

উপন্যাস নাটক নয়। নাটক সম্পূর্ণত ঃ সংলাপনির্ভর শিল্প। কিন্তু উপন্যাস গড়ে ওঠে বর্ণনা ব বিবৃতি এবং সংলাপের সমবায়ে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বিবৃতিকার এবং সংলাপ-রচয়িতার ভূমিকা ব্যতীতও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রের প্রত্যক্ষ সংলাপ ব্যবহারের পরিবর্তে সেই সংলাপকে নিজের ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন, অথচ এর জন্য চরিত্রগুলি যেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি, তেমনই উপন্যাস-ঘটনাও কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ভাষা বস্তুধর্মী, নিরাবেগ, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য-অনুগ।এই ভাষায় অতিশয়োক্তি প্রায় নেই;কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষায় কবিত্ব ও অতিশয়োক্তি সঞ্চারের

সম্ভাবনা সৃষ্ট হলেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মমভাবে আবেগের কণ্ঠরোধ করেছেন, শব্দব্যবহারের হয়ে উঠেছেন অত্যন্ত কৃপণ।

কখনও সংক্ষিপ্ত বাক্যে, ছোট ছোট বাক্যবন্ধে বৈষম্যমূলক সমাজের কথা, দরিদ্রের বঞ্চনা ও যুগ যুগ লাঞ্ছিত অপমানিত জীবনের কথা অনায়াস-পটুত্বে ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন। অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্চী পরিবেশ, ততোধিক নোংরা অপরিষ্কার শরীর ও পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনপ্রবাহ সেখানে জান্তব অথবা যান্ত্রিক, আদিম প্রবৃত্তি আর স্থূল কামনাবাসনার উতরোল একদল সৃষ্টিছাড়া জীব-এসবের বর্ণনায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবিকল নিস্পৃহ দ্রষ্টা, নির্মোহ ও আবেগহীন তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি। যে মালাকে কুবের একদা মনে করে গৌরবর্ণা রাজরাণী, সেই মালারই বর্ণনায় ঔপন্যাসিক কত সত্যবাদী তার পরিচয় মেলে অসাধারণ শব্দগ্রন্থণে-মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরণে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়। পারিপার্শ্বিক বর্ণনাও লক্ষ্য করার মত-লখা ও চন্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা-ভিজা গায়ের চামড়া। ডিবরির শিখাটি ঊর্ধ্বে ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরের চালে পচা পচা শণ,চারি পাশের দেয়াল চেরা বাঁশের, স্যাঁতসেতে মাটির থেকে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনব সুমার্জিত সভ্যতার।''

জেলেপাড়ার জীবনের একঘেয়ে বারোমাস্যা কি আদিম,অমার্জিত, সৌষ্ঠবহীন;সৃষ্টির আদি থেকে কী অপরিবর্তনীয় তাদের জীবনচর্যা, বেঁচে থাকার অসম সংগ্রাম আর জীবনসমুদ্র-মন্থনজাত গরলের একমাত্র ভাগীদার এই নীলকণ্ঠ প্রান্তেবাসী মানবসমাজ একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে ভদ্রসমাজের মার খেয়ে কী পরিমাণ মৌল ও সহিষ্ণু এবং সেইসঙ্গে আত্মঅবক্ষয়ের নেশায় মশগুল তার পরিচয় পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা বর্ণনায়-''জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোন দিন সাঙ্গ হয় না।এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্তর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়ে বাজে।আসে রোগ, আসে শোক।.....জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায় আর দেশী মদে! তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।''

'পদ্মানদীর মাঝি'তে চরিত্রভিত্তিক কিছু সংলাপ আছে যেগুলি চরিত্রটির প্রায় আইডেন্টিটির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। যেমন হোসেন চরিত্র, তার সংলাপে অনেক সময় আছে প্রচ্ছন্ন আদেশের সুর-''ঘুমাও গা কুবির। আর শোন বাই, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাতে মনে মনে খুইও, কইয়া কাম নাই।'' হোসেন এমনি করেই সতর্ক করে।

বসিরের যুবতী-পত্নীর সঙ্গে এনায়েতের গোপন প্রেমের সংবাদ কুবের হোসেনকে দিলে হোসেন শীতল মেজাজে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করে। হোসেন মিয়ার অন্যায়কার্যের প্রত্যক্ষদর্শীকে হোসেন এমন ভঙ্গীতেই সতর্ক করে। আবার কখনও চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ সমার্থক হয়ে ওঠে। যেমন ''হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসে, বলে বৈঠা ধর গিয়া কুবির বাই। হোসেন মিয়া থাকতি কারে ডরাও?'' হোসেন মিয়ার এই হাসি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গভীর অভিসন্ধি কিংবা ধূর্ত পরিকল্পনা মনের মধ্যে জেগে উঠলে হোসেন মিয়ার এই 'মৃদু হাসি' উপন্যাস ঘটনায় ফিরে ফিরে আসে। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তের বাড়িঘর তৈরী করে দিয়ে হোসেন মিয়া যখন সব লিখিয়ে নেয়,

টিপ্পনী

তখনও সে 'মৃদু মৃদু' হাসে এবং হাসতে হাসতে বলে গরীবমানুষদের উপর তার দরদের কথা। কুবের বিরক্ত কিংবা ক্ষুব্ধ হলে মুদ্রাদোষের মত কিছু কথা বলে থাকে, যেগুলি ভাষার একটু হেরফের ঘটিয়ে উপন্যাস কাহিনীতে একাধিক বার শোনা যায়। যেমন- ''গা জ্বালাইয়া কথা কস যে!'' কিংবা ''যা যা বাড়িত যা, বাজে বকস ক্যান?'' কপিলার শ্বশুরবাড়িতে অপমাণিত কুবের কপিলাকে বলে-''ব্যাজাল পাড়িস না, তর ব্যাজালে গাও জ্বলে।''

টিপ্পনী

হোসেন মিয়া যেমন এই উপন্যাসে রহস্যময় চরিত্র, তেমনি কপিলাও। কপিলার যৌবনরসমন্ডিত চেহারা, বন্যহরিণীর মত চঞ্চলতা, রঙ্গ-রসিকতা, বাক্‌পটুতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং অসহায় অবস্থার মধ্যেও একধরনের মৌন প্রতিবাদ (শ্বশুরবাড়ির জীবন) চরিত্রটির সংলাপে ও আচার-আচরণের বর্ণনায় লেখক জীবন্ত করে তুলেছেন।

মালার সংলাপ অন্তর্মুখী চরিত্রের মতই শান্ত ও অর্থব্যঞ্জক। গণেশ ধনঞ্জয়, রাসু, আমিনুদ্দি বৈকুণ্ঠ, কপিলার মা এই সমস্ত অপ্রধান চরিত্রের ভাষাও উপন্যাস-চালচিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই।

পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরে এই উপন্যাসের পটভূমি, তাই চরিত্রের সংলাপে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে পূর্ববঙ্গের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের উপভাষা এখানকার চরিত্রগুলির একমাত্র ভাষা নয়, সেখানে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার নানা উপভাষারীতি মিলেমিশে রয়েছে। মাঝিদের জীবন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বদ্ধ থাকে না, নদীর বুকে তারা সঞ্চরণ করে অহর্নিশ, কত জেলা, কত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তাদের মেলামেশা-সেজন্য তাদের ভাষাতেও রয়েছে সবকিছুর একটা মিশ্রপ্রতিফলন।

পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার ব্যবহারেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রভিত্তিক সংলাপ সংযোজনার ব্যাপারে সচেতনতা লক্ষনীয়। কুবের, কপিলা, মালা, রাসু, মুসলমান চরিত্র আমিনুদ্দি, রসুল এবং বিশেষ করে হোসেন মিয়ার সংলাপে সেই চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করার মত।

কুবেরের সংলাপ ঃ

- 'হু, গীত না তর মাথা।'
- 'করুম না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই।'
- 'আজ তো শ্যাষ না, আরেক দিন আইলে মাইরা খেদাইয়া দিমু-আমার লগে চালাকি কইরা যাইব কই?'
- 'তা শুনিয়া তোর কাম কী? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা
  যত পারস-রাও করস কেন রে?'
- 'খাটাসের মতো হাসিস্ ক্যান কপিলা, আঁই?'
- 'বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা।'
- 'গাও জ্বলে! গরু-ছাগল ভাবস আমারে তুই, খেলা করস আমার লগে! তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইরা
  গেলাম তরে।'

মালার সংলাপ ঃ

- ‘গাও-জ্বালাইয়া কথা দেহি খইর-পারা ফোটে, মায় নি মুখে মধু দিছিল আঁতুড়ে?’
- ‘ছলগুলা লইয়া যাও, বিছানার তলে ছল দেওন না দেওন সমান।’
- ‘আই গো তোমার পাষাণ প্রাণ। আমার বাপ-ভাই ডুইবা মরে, একবার নি খবর নিলা!’

কপিলার সংলাপ ঃ

- ‘নাও নিয়া আইলা মাঝি, বইনের আনলা না ক্যান। কতকাল দেখি নাই বইনরে। পোলাপানগো তো আইনবার
  . পারতা?’
- ‘যাইবা যাও, কী আর কমু তোমারে? এউক্কা কথা কইয়া দিই মাঝি, মাথা খাও, দিদিরে কথাটা কইও, কপিলা পরের
  ঘরের বৌ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই।’

হোসেন মিয়ার সংলাপ ঃ

- ‘ছালাম। কেমন ছিলা মাঝি? কাহিল মালুম হয়?’
- ‘তোমারে ঠকাইয়া হোসেন মিয়ার ফয়দা কিসির? কোন হালারে আমি জবরদস্ত ময়নাদ্বীপি নিচ্ছি?’
- ‘জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির? লিখা খুইলাম, হিসাব থাকব-না ত কিসির কাম খত দিয়া!’
- ‘আরে বলদ তুমি! বাই বইলা হাসিল, দ্যাশ গাঁও ছাইড়া দ্বীপের মদ্যি আইসা রইছ, বাই-বইল না মাইয়া মরদ অ্যানে?
  ভাল কাম কর নাই মিয়া। তিন রোজ বাইন্ধা থুমু তোমারে, খানাপিনা মিলব না।’

উদাহরণের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এরকম জীবন-নির্ভর সংলাপ, যে সংলাপ চরিত্রগুলির স্বতন্ত্র ‘আইডেন্‌টিটি’ তৈরী করে।

প্রত্যক্ষ সংলাপ ছাড়াও অনেক সময় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভাষায় চরিত্রের সংলাপগুলি পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, সেখানেও স্বয়ং ঔপন্যাসিক যেন উদ্দিষ্ট চরিত্রের ভূমিকায় নিপুণ অভিনয় করেন। যেমন মালার পরিবর্তিত সংলাপ ঃ

‘‘মেয়ের জন্য কুবের দশবার হাসপাতাল যাইতে আসিতে পারে, মালাকে একবার শুধু একটিবার লইতে তাহার আপত্তি! হ, অনেক পাপ করিয়াছিল আর জন্মে মালা, এবার তাই এমন কপাল লইয়া জন্মিয়াছে।’’

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের মাঝি-মাল্লাদের জীবনযাত্রা, কথাবার্তা এবং প্রাত্যহিক নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়েছিলেন-‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে সেই ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে।

উপন্যাসটির যে সমস্ত স্থানে বর্ণনাপ্রসঙ্গ এসেছে সেখানে ঔপন্যাসিক বাংলা গদ্যভাষার

টিপ্পনী

সাধুরীতিটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধুরীতির গদ্য হলেও তা বাস্তবতামন্ডিত, জীবননির্ভর ও যথাসম্ভব কৃত্রিমতাবিহীন ও নিরাবেগ। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও তার বাস্তবমুখী সাহিত্যচর্চা ও অকৃত্রিম ভাষারীতির প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা নানা রচনায় ব্যক্ত করেছেন।

সাধুগদ্যরীতি ঃ মেজবাবু তো হোসেন মিয়া নন। দুর্নীতি, দারিদ্র, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নীচুস্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভর, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা–এসব যাহাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যাহারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যাহারা গরীব ছোটলোক, মেজবাবু কেন তাহাদের পাত্তা পাইবেন?

টিপ্পনী

এভাষা ঋজু, তীক্ষ, তির্যক, অর্থগভীর ও বক্তব্যের মর্মমূল পর্যন্ত প্রসারিত।

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১. 'পদ্মানদীর মাঝি' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস কিনা বিচার করুন।

২. 'পদ্মানদীর মাঝি' পদ্মার তীরবর্তী দরিদ্র ধীবর সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবন আলেখ্য–এই উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র ও ভাষা অবলম্বনে মন্তব্যটির যাথার্থ্য নির্ণয় করুন।

৩. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের নায়ক–চরিত্র নির্ধারণ করুন।

৪. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের চরিত্রের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করুন। অথবা গোষ্ঠীজীবনের প্রতিনিধি হয়েও কুবের শেষপর্যন্ত তার গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একক চরিত্র হিসাবেই উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে–এই মতটি কতদূর গ্রহণযোগ্য?

৫. মালা ও কপিলা দুই সহোদরা কিন্তু তাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন–উপন্যাস–ঘটনায় চরিত্রগুলির এই বৈপরীত্য কতখানি প্রভাব–বিস্তার করেছে আলোচনা করুন।

৬. কুবেরের জীবনে মালা ও কপিলার প্রভাব নির্ণয় করুন।

৭. হোসেন মিয়া মহত্ত্ব ও ধূর্ততার এক মূর্ত প্রতীক–ব্যাখ্যা করুন।

৮. 'পদ্মানদীর মাঝি'র এক রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া–চরিত্রটির রহস্যময়তার উপর আলোকপাত করুন।

৯. হোসেন মিয়া–চরিত্রটি শেষপর্যন্ত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির নিয়ন্ত্রক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে–মন্তব্যটির যাথার্থ বিচার করুন।

১০. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির কাহিনী নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে আপনার অভিমত প্রদান করুন।

১১. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে ভাষাশিল্পী হিসাবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যের মূল্যায়ন করুন।

১২. 'পদ্মানদীর মাঝি'তে ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলির উপন্যাসগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. 'কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই।'-কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে? কুবেরের জীবনের বাস্তব অবস্থা উল্লেখ করে মন্তব্যটির সারবত্তা নির্ণয় করুন। (১ম পরিচ্ছেদ)

২. 'কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত।'
-'সে' কে? কুবেরের প্রতি তার আনুগত্যের পরিচয় প্রদান উপলক্ষ্যে চরিত্রটির বিশিষ্টতা নির্ণয় করুন। (১ম পরিচ্ছেদ)

৩. 'মিছা কইলাম নাকিরে কুবের? জিগাইস না, গণেশ আইলে জিগাইস।'
-বক্তা কে? তার পরিচয় দিন? বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছে? চরিত্রটি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? (১ম পরিচ্ছেদ)

৪. 'তুই যে দেখি কালীকুঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইক্কা?'
-বক্তা কে? 'গোরাচাঁদ' কাকে বলা হয়েছে? বক্তার এরূপ উক্তির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করুন। (১ম পরিচ্ছেদ)

৫. 'পদ্মার ওপারে আছে সোনাখালি গ্রাম, রথের উৎসব হয় সেখানে।' -উপন্যাস কাহিনীতে রথের উৎসব ও মেলার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার পরিচয় দিন। (২য় পরিচ্ছেদ)

৬. 'শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক।'
-প্রসঙ্গ নির্দেশ করে উদ্দিষ্ট চরিত্রটির মানসিকতার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করুন। (২য় পরিচ্ছেদ)

৭. 'তবু লোকটার আবির্ভাবে চিরদিন দুর্জ্জেয় আশঙ্কা তাহাকে অস্বস্তি বোধ করায়।'
-লোকটি কে? 'তাহাকে'-কাকে? লোকটির আর্বিভাবে আশঙ্কা ও অস্বস্তি কেন সৃষ্ট হয় ব্যাখ্যা করুন। (২য় পরিচ্ছেদ)

৮. 'না মনে মনে ইহা বিশ্বাস করে না জেলেপাড়ার কেহই;'
-কি বিশ্বাস করে না?কার সম্পর্কে এই অবিশ্বাসের প্রসঙ্গ? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে এই অবিশ্বাস কেন? (২য় পরিচ্ছেদ)

৯. 'আমি আলাম গো কুবিরদা।'
-কে বলেছে? বক্তার কোথা থেকে আমার কথা বলা হয়েছে? তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দাও। (২য় পরিচ্ছেদ)

১০. 'জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, অ্যানে আইজ তোমরা ঘা দিলা, এই দিনের মদ্যি।'

-প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক বক্তার এই উক্তির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। (২য় পরিচ্ছেদ)

১১. 'হোসেন এখন লাজুক। সে এদিক ওদিক তাকায়।' -হোসেন 'লাজুক' কেন? প্রসঙ্গটি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করুন। (৩য় পরিচ্ছেদ)

১২. 'খুশ হলি না পারি কী?'
-কে, কাকে বলেছে? প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করুন। (৩য় পরিচ্ছেদ)

টিপ্পনী

১৩. 'জীবনে আর তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই,...' -কার কথা বলা হয়েছে? তার উদ্দেশ্য কি? সেই উদ্দেশ্যপূরণের জন্য সে কি করেছে? (৩য় পরিচ্ছেদ)

১৪. 'কী প্রতিভা লোকটার, কী মনের জোর;' -কার সম্পর্কে কে একথা ভেবেছে? এরূপ ভাবার কারণ কী? (৩য় পরিচ্ছেদ)

১৫. 'ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।'
-'ওই গ্রাম' এবং 'এখানে'-কোন্ কোন্ স্থান নির্দেশিত হয়েছে? কাকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না? এরূপ মনে করার কারণ কী? (২য় পরিচ্ছেদ)

টিপ্পনী

১৬. 'কে জানে কী আছে কপিলার মনে?'
-কপিলা সম্পর্কে কার এই আশঙ্কা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন। (৪র্থ পরিচ্ছেদ)

১৭. 'ঘুম আসিবার আগে কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।'
-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চরিত্রটির মানসিকতা বিশ্লেষণ করুন। (৪র্থ পরিচ্ছেদ)

১৮. 'লিখা থুইলাম, হিসাব থাকব-না ত কিসির কাম খত দিয়া।'
-কে কোন্ প্রসঙ্গে কাকে বলেছে?'খত' কী? উক্তিটির মধ্যে বক্তা-চরিত্রের কোন্ দিকটি প্রতিফলিত হয়? (৫ম পরিচ্ছেদ)

১৯. 'কুচরিত্তির হইচ্ছস, আই?'
- কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? প্রসঙ্গটি সবিস্তার ব্যাখ্যা কর। (৭ম পরিচ্ছেদ)

২০. 'একি কদর্য একটা দ্বীপ হোসেন বাছিয়া লইয়াছে?'
-দ্বীপটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২১. 'হ, কপিলা চলুক সঙ্গে।'
-এই অভিমত কার? কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ সিদ্ধান্ত?

তৃতীয় একক

অতিথি

ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টিপ্পনী

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ছোটগল্পের জগতেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন অনন্য রুপশিল্পী এর সার্থক স্রষ্টা সর্বোত্তম রুপকার। রবীন্দ্র সাহিত্যে ছোটগল্পের স্বর্ণফসল উদ্‌গত হয়েছে উত্তরবঙ্গের উর্বর মৃত্তিকায়। জমিদারী কার্য উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথকে যেতে হয়েছিল শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের এই শিলাইদহ যাত্রা তাঁর ব্যক্তিগত সাহিত্য জীবন তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ এর ফলেই "পদ্মার চর থেকে সোনার তরীতে বোঝাই করে চোটগল্পের সোনার ফসল তিনি বঙ্গ ভারতীর বন্দরে পৌঁছে দিলেন।" পদ্মার তীরলগ্ন প্রকৃতি ও জনপদের বুকে তিনি আবিস্কার করলেন মানবজীবনের বহু অদেখা দিক এবং মানবজীবন সত্যের রহস্যময় সম্ভার। এক দিকে অভিনব প্রকৃতি বোধ অন্য দিকে অকৃত্রিম জীবন বোধে এই সময় রবীন্দ্রনাথের মানসজগৎ হয়ে উঠল সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন–

" বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মাথেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে ইছামতী থেকে বড়লে হুড়ো সাগরে চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে যমুনা পেরিয়ে সাজাদ পুরের খাল বেয়ে সাজ্জাদপুরে। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের পথে ফেরা এই অভিজ্ঞতার ভূমিকায়। মাটির স্পর্শ আর কবিকল্পনার অমিত ঐশ্বির্যের সংমিশ্রণে তাঁর ছোটগল্প হয়ে উঠেছে জীবনের ভাষ্যস্বরুপ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি হল যেন গদ্যের ভাষায় জীবনের বাঙ্ময় কবিতা গীতিকবিতার মতই সেগুলি অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনাধর্মী। ছোটগল্প সম্পর্কে তাঁর নিজের ভাবনটির প্রকাশও ঘটিয়েছেন কবিতার আঙ্গিকে ।

" ছোটপ্রাণ ছোট ব্যথা ছোটছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

১২৯৮ বঙ্গব্দে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হল হিতবাদী পত্রিকা। পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদক নিযুক্ত হলেন রবীন্দ্রনাথ। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পত্রিকাটির প্রত্যেক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একটি করেছোগলল্প প্রেরণ করতে লাগলেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

পর পর কয়েকটি সপ্তাহে সেখানে প্রকাশিত হল দেনাপাওনা গিন্নী পোস্টমাস্টার তারা

প্রসন্নের কীর্তি ব্যবধান এবং রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু এরপরই পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে গল্পের পরিবর্তে হাল্‌কা রসের গল্প লেখার অনুরোধ করলে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ সাধনা প্তিককার সম্পাদক পদে বৃত হয়ে আবার নতুন করে ছোটগল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই পর্যায়ে রচিত হল ত্যাগ সমস্যাপূরণ খাতা বিচারক দিদি প্রায়শ্চিত্ত। সমাজ সমস্যামূলক এই গল্পগুলির পাশেই রয়েছে পরাধীনতার মর্মজ্বালা নিয়ে লেখা মেঘ ও রৌদ্র গল্প। আমলা তান্ত্রিকতা ও পুলিশের সমালোচনারুপে প্রকাশিত দুর্বুদ্ধি ইত্যাদি রচনা। অন্যদিকে " কবি কল্পনার ঝংকার বেজে উঠল ক্ষুধিত পাষার্ণের মালব কৌশিক রাগে অতিথির মল্লারে এক রাত্রির বেহাগে।'' বিচিত্র রস পরিবেশিত হল মহামায়া জীবিত ও মৃত সম্পত্তি সমর্পণ মণিহারা ইত্যাদি গল্পে। ১৮৯১থেকে ১৯০০ খ্রীঃ এই দশ বছরের মধ্যে বাংলা ছোট গল্পেকে পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্যে রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাসিত করে তুললেন।

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প মানবজীবনের এক অফুরন্ত রত্নভান্ডার। এদের কোথাও রয়েছে গ্রাম্য সাধারণ মানুষের সারল্য কোথাও অপরিমিত ধনলোভ ও তজ্জনিত ট্র্যাজিডি কোথাও প্রকৃতির সঙ্গে মানবচরিত্রে অদ্বয় সম্পর্ক ব্যজ্জনা কোথাও নিখিল পিতৃসত্তার চিরন্তিন ঐক্যময়তা আবার কোথাও অভূতপূর্ব কাব্যানুভূতির সঙ্গে অপূর্ব মনোবিকলন দক্ষতার আশ্চর্য সমন্বয়। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত জগতের রহস্যময় সীমানায় মানবজীবনকে স্থাপন করে এক অভিনব শ্রেণীর গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প হল ক্ষুর্ধিত পাষাণ যেটি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও উল্লিখিত হওয়ারদাবী রাখে।

'সবুজপত্র'-এর যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গুলি হল - হৈমন্তী স্ত্রীর পত্র ভাই ফোঁটা পয়লা নম্বর পাত্রও পাত্রী। রবীন্দ্রনাথ শেষ গল্প সংগ্রহ তিন সঙ্গীতে বিচিত্র চরিত্র ও অভিনব বক্তব্যের উপস্থাপন করেছেন। গল্পগুলির দ্রুত গতিবেগ ও চরিত্রের অদ্ভুত গতিশীলতা পাঠকমনকে যুগপৎ বিস্থিত ও রোমাঞ্চিত করে। এই পর্যায়ে রবিবার ল্যাবরেটারী ও শেষ কথায় তিনি আধুনিক নাগরিক মনের উজ্জ্বল শাণিত অনুভূতির যে চিত্র এঁকেছেন তা বাংলা ছোট গল্পের জগতে অত্যন্ত অভিনব বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

কঠোর বাস্তবতা রাষ্ট্র রাজনীতির কোলাহল অর্থনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নেই সেখানে আছে মানুষের চিরকালীন সত্যপরিচয় আছে দুঃখ ব্যথা আশা আনন্দের ক্ষুদ্র অথচ মহৎ জগৎ। তাই তাঁর ছোটগল্প "যুগসম্ভব হয়েও যুগাতিক্রমী স্থানিক হয়েও সর্বদেশীয়।''

অতিথি গল্পের পটভূমিকা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও নাম করণের ব্যঞ্জনা

সাধারণ ভাবে বলা যায় ছোটগল্প মানবজীবনের কোন নিগূঢ় ভাবসত্যকে বাঙ্ময় করেতোলে। ছোট গল্প রচয়িতার নিজস্বাজীবনাবেগ এবং জীবন অনুসন্দিৎসা গল্পের সূচনা আরোহ গতি চরম মুহূর্ত ইত্যাদি স্তর পরম্পরা শিল্পোৎকণ্ঠার সঙ্গে অতিক্রম করে যখন উপসংহারে উপনীত হয়, তখন পাঠক গল্পের বক্তব্যবিষয়ের মধ্যে জীবনের সূক্ষা প্রতিবিম্ব দর্শন করে বিমুগ্ধ হয়ে যান। মানবজীবনের পারিপার্শ্বিক জুড়ে রয়েছে এ প্রকান্ড বিশ্ব ব্রক্ষান্ড প্রকৃতি সেই বিশ্বব্রক্ষান্ডেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জীবন এবং প্রকৃতি তাই অদ্বয় সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রকৃতি য়ে নিছক প্রাণহীন

জড়বস্তু নয় কিংবা নয় অন্ধ নিয়তি শক্তি তা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে শুরু করে ফরাসী দার্শনিক রুশো অথবা ইংরেজ রোম্যান্টিক কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের জীবনদর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতি একদিকে নিষ্পাপ, অন্যদিকে নির্মম। এক মাত্র প্রকৃতির রাজত্বেই রয়েছে নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রকৃতি প্রকৃতি অর্থেই স্বার্থদ্বন্দ্ববিমুক্ত। এক অপরিসীম নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিস্পৃহতায় সে তার নিজস্বা ছন্দ ও তালে সম্মুখপানে অগ্রসর মান। অন্যদিকে প্রকৃতি হল মুক্ত স্বাধীন এবং প্রচন্ড আত্মশক্তিতে অবিচল ও সুদৃঢ়। প্রকৃতির এই স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতিকে মানষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে অভিহিত করেছিলেন। রুশো চেয়েছিলেন প্রকৃতির বুকে শিশুর জীবনের বিকাশ ঘটাতে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে অস্বীকার করে জীবনের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়না বলে মনে করতেন। অতিথি গল্পের তারাপদ চরিত্রের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জীবন ও প্রকৃতি সেরকমই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক সম্পর্কে গ্রথিত হয়েছে।

টিপ্পনী

অতিথি গল্পের সারবস্তু কোন প্লটপ্রধান ছোট গল্পের গতানুগতিক শিল্পরীতিকে অবলম্বন করে বিন্যস্ত হয়নি। এক স্বাধীনচেতা বালকের সংসারের প্রতি বন্ধন বিমুক্ত বৈরাগ্যের রসতিলকে এই গল্পের সমগ্র পটভূমিকা রচিত হয়েছে। বহু সন্তান সন্ততিযুক্ত একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের স্নেহ মায়া মমতায় প্রতিপালিত তারাপদ কেমন কের সমস্ত স্নেহ প্রাচুর্যকে উপেক্ষা করেজীবনের অনিদৈশ্য পথে পা বাড়িয়েছিল কেমন করে সংসার তীর্থে অধিষ্ঠান করেও সংসারের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল জীবন পথের চিরপথিক তারাপদর জীবনের সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী হল অতিথি ছোটগল্পটি।

তারাপদ সাংসারিক কিন্তু অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহবন্ধনহীন স্বাধীনতার জন্য তার চিত্ত সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকত। সংসারের মায়াজালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখলেই সেই মায়াজাল সে অক্লেশে ছিন্ন করত। এজন্যই গৃহের বন্দনকে উপেক্ষা করে এক সময় যাত্রা দলে যোগ দিয়ে সেখাে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেও মায়ার বন্দনকে সে ছিন্ন কেছিল অবলীলায়।

অসীম আকাশ সীমাহীন দিগন্ত প্রবহমান নদী কিংবা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রারত তরণী তার কাচে বয়ে আনত অসীমের সংবা। সীমার বাঁধন কেটে সে তন অসীমের পথে বিবাগী হয়ে যেত মুক্ত জীবনানন্দে। তারাপদ সঙ্গীত প্রিয় কিন্তু হরিণ শিশুরমত বন্দন ভীরু। কেবল সঙ্গীত প্রিয়তা নয় গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ত আখাসে মেধ গর্জন করত কিংবা অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করত তখন তাহার চিত্ত উচ্ছৃঙ্খল হউয়া উঠিত। তারাপদ খাঁচার সেই পাখী যে নিজেই খাঁচার দরজা উন্মুক্ত করার অলৌকিক শক্তি অর্জন করে ইচ্ছামত আকাসে উড্ডীন হয়। বস্তত এই মুক্ত চিত্ততা নিসর্গ প্রকৃতিরই আন্তরধর্ম।

মতিলালবাবুর সঙ্গে তারাপদ আকস্মিক যোগাযোগ তার জীবন রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত একই নাটকের একটি নতুন দৃশ্যের অবতারণামাত্র। মতিলাল বাবুর স্নেহ ও প্রশ্রয়, অন্নপূর্ণার আন্তরিক বাৎসল্য, চারুর অভিমান ও জেদ এসমস্তই তারাপদর জীবনে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার পটভূমি কিন্তু সেই পটভূমিতে তারাপদ সর্বদাই একজন নির্লিপ্ত নায়ক। কারণ অন্তকরণে তারাপদ সর্বদাই নিস্পৃহ সন্ন্যাসী সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইত কৌতূহলবশত যত বারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। বস্তুত চুতর্দিকে পরিব্যাপ্ত এই এই জলস্থল আকাশ চারিদিকের সজীবতা ও মুখরতা

মহাদিগন্তের এই নির্লিপ্ত নির্নিমেষ চিরস্থায়ী বাক্য বিহীনা সুদূরতা ছিল এই বালকের পরম আত্মীয়। তাই বলা যায় এই উদার উন্মুক্ত প্রকৃতিই তারাপদকে ক্ষুদ্র সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন করার গোপন মন্ত্রটি শিখিয়েছিল।

টিপ্পনী

প্রকৃতি নিত্য সচলা ,বিরামবিহীনা বিশ্রাম তার কাছে আলস্যমাত্র। প্রকৃতির এই শ্রান্তিহীন কর্মজ্ঞে যে নিত্য ক্রিয়াশীলতা তার প্রতিফলন তারাপদ চরিত্রে ঘটেছে। মতিলালবাবুর সহযাত্রী হয়ে তারাপদ সর্বকর্মেই যে অসাধারণ স্বভাবপটুত্ব ও সাবলীলতা প্রদর্শন করেছে তার থেকে বোঝা যায় তারাপদ প্রকৃতির মতই সচল ও সক্রিয় চরিত্র। নৌকার হালধরা থেকে শুরু করে পাল ঠিক করা বন্ধন থেকে শুরু করে নিখুঁত সঙ্গীত পরিবেশন করা সকল কাজেই ছিল তার অনায়াস অথচ আন্তরিক সংযোগ " তাহার দৃষ্টি তাহার হস্ত তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে।'' প্রকৃতির মতই তারাপদ নিশ্চিন্তও উদাসীন অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। ভূত ভবিষ্যতের সঙ্গে তার যেন কোনই সঠিক সম্পর্ক নেই সম্মুখা ভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য। তারাপদর ব্যক্তিত্ব অনমনীয় কিন্তু অ রুঢ়। সকল বিষয়েই তার একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে অথচ সেই ব্যক্তিত্ব কাউকে অকারণে আঘাত করে না। চরিত্রটির এ যে স্বাতন্ত্র্য তা প্রকৃতির মতই নিয়মসিদ্ধ ও অনিবার্যে।

তারাপদর প্রকৃতি সংসারের বিশেষ কোন সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ ছিল না। অভিজাত পরিবার থেকে শুরু করে পর্ণফটীরবাসী বেদে বেদুইন সকলের প্রতিই সে ছিল সমনোভাবা পন্ন"বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে রাখালের সঙ্গে রাখাল অথচ ব্রাক্ষণ।'' এই মুক্তস্বভাব তারাপদই মতিলাল বাবুর পরিবারে দীর্ঘকাল অবস্থান করে তার মৌল স্বভাবধর্মের ব্যক্তিক্রম ঘটাতে চলেছিল। কোন এক স্থানে দীর্ঘ দুবছর অতিবাহিত করা নিঃসন্দেহে তার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। এই পরিবারে অভস্থান কালেই তারাপদর চরিত্রের মধ্যে সংসার আসক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সংসারী মানুষের মোহজালে তার বৈরাগ্যের উজ্জ্বল তিলক ক্রমশ তারউন্নত ললাট থেকে যেন বিলীয়মান হয়ে উঠেছিল। যে বালিকা চারুর উপস্থিতি তারাপদর কাছে এত দিন ছিল নিতান্ত কৌতুক ও ছেলেখেলার নামান্তর সেই চারুরই উপস্থিতি "এই নিলিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাম্ভণ বালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎ স্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিত।'' তারাপদর চিত্ত সংসার সাগরে উত্থিত ঊর্মিমালার উন্নত চূড়ায় মুক্তির যে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে আসছিল, শেখানে তারাপদর অজ্ঞাতে বন্ধনের এক অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কের ঊর্ণনাভ রচনা করেচলল। ' দিবাস্বপ্নজালের' এই চরিত্র বিরুদ্ধতায় তারাপদ সেই মুহূর্তেই সচেতন হয়ে উঠল। কারণ সে লক্ষ্য করেছিল লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ছবিগুলির অর্থব্যঞ্জনা তার কল্পনালোকে এত দিনকার সৃজিত অর্থব্যঞ্জনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা " অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙীন। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া শে আর পূর্বের মতস্বাভাবিক পরিহাস করিতে পারিতনা নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন এ আবদ্ধ আসক্তভাব তাহার নিজের কাছে এক নতুন স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।''

ইতোমধ্যে তারাপদর অগোচরে মতিলালবাবুর তাঁর কন্যার সঙ্গে তারাপদর বিাবহের দিন ধার্য করে ফেলেছিলেন। বিবাহ আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ কিন্তু একেবারে অন্তিম লগ্নে তারাপদর অন্তর্ধান সমস্ত ঘটনাধারাকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিল। বহির্বিশ্বের অসীমতা এখানে তারাপদকে 'গৃহছাড়া, লক্ষীছাড়া' করে তুলেছে। কুড়ুল কাচায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রা

উপলক্ষ্যে নদীপথে ধেয়ে চলেছে অসংখ্যমানুষ। তারাপদর মুক্ত মনওপলকের মধ্যে সেই চিরন্তন গতিপথের পথিক হয়ে উঠল।

তিথি না মেনে যে আসে আবার তিথি না মেনেই য়ে বিদায় নেয় সংসারে সেই ক্ষণিকের আগন্তককে আমরা বলি অতিথি। তারাপদ মানব সংসারের সেই চরিত্র যে সংসারে আচম্বিতে আশ্রয় নেয় আন্তরিক অভ্যর্থনা পায় এবং নিজেও আন্তরিকতা উপহার দেয় কিন্তু স্বল্প সময়ান্তরে চলে যায় অন্য আশ্রয়ের খোঁজে। কোনও ক্ষোভ নয় কোন অভিমান নয় এ শুধু চলে যাওয়ার জন্যই চলে যাওয়া তার জীবনের মূল মন্ত্র " হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে।'' তারাপদর জীবন মূল্যায়নের উপসংহারে চরিত্রটির মধ্যে অতিথি সুলভ যে নিরাসক্ত ধর্মটি আমরা আবিস্কার করি সেই নির্মোহ ভাব ও নির্লিপ্তি যেন নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে অবিনাস সম্বন্ধে আবদ্ধ।

টিপ্পনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. 'অতিথি' ছোটগল্পের একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত -বিষয়টি বিশদ কর।

২. 'অতিথি' গল্পের নামকরণের পার্থক্যতা বিচার কর।

৩. 'অতিথি' গল্পের তারাপদ প্রকৃতির বন্ধনহীন সত্তা - বিশ্লেষণ করুন।

৪. 'অতিথি' গল্পে প্রকৃতির উপস্থাপনা কেবল কাহিনীর পশ্চাৎপট হিসেবে নয়, মানবজীবনের সঙ্গেও রয়েছে তার ওতপ্রোত সম্পর্ক - প্রাসঙ্গিক উদাহরণসহ বিষয়টি আলোচনা করুন।

৫. তারাপদ বন্ধনভীরু উদার-মুক্ত চরিত্র, সে মানবসংসারের অতিথি - সংসার জীবনে তার ব্যক্তিচরিত্রের মহিমা কতখানি সে বিষয়ে আপনার অভিমত প্রদান করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. 'ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়ে কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।'
'ইহার মা' - কার মা? উদ্ধৃত অংশে কার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে? এই রূপ ভাবনার পরিচয় সপ্রসঙ্গ উল্লেখ করুন।

২. 'তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু, আবার হরিণের মতো সংগীতমুগ্ধ।'
একটি করে উদাহরণের সাহায্যে তারাপদ বন্ধনভীরুর ও সংগীতমুগ্ধতার পরিচয় দিন।

৩. 'কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।'
চারুশশী কে? তার অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হওয়ার কারণ কি?

৪. 'তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইত।'
ব্রাহ্মণ-বালক কে? তার চিত্তচাঞ্চল্যের বিষয়টি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করুন।

৫. '..... এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়েছে।'
উদ্ধৃত অংশটির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করুন।

টিপ্পনী

আশৈশব অরণ্যের প্রতি তাঁর ভালোবাস অগাধ আরণ্যক জীবনের প্রতি তাঁর টান এতই প্রবল ছিল যে জংলী বাবু বলে তাঁর পরিচিতি ছিল বাড়ীর ভৃত্য সমাজে। তিনি বনফুল প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম তাঁর বিহারে। পেশায় ডাক্তার নেশায় সাহিত্য রচনা। বিহারের পটভূমি তাঁর উপন্যাসে ছোটগল্পে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছেন বিহারে তবে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিয়মিত শেষজীবন তিনি অতিবাহিত করেন কলকাতায়।

বনফুলের সাহিত্য প্রতিভা বিস্ময়কর। সাহিত্যের বিবিধক্ষেত্রে তিনি অনায়াস বিচরণ করেছেন। কবিতা, গল্প ,উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা সর্বশাখাতেই তিনি রেখেছেন অসাধারণ কৃতিত্বের ছাপ।

বনফুলের প্রতিভা সর্বত্রচারী হলেও কথা সাহিত্যের মধ্যেই তিনি তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রটি খুঁজে পেয়েছিলেন। লোকায়ত জীবনের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত এক মহাজীবন পরিক্রমা করেছিলেন তিনি। মানুষের অসহায়তা দারিদ্র্য , বঞ্চনা ,শোষণ, শাসন, অত্যাচার ইত্যাদি আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে আদিম মনোবৃত্তি সব কিছুই তাঁর উপন্যাস ছোটগল্পের বিষয়বস্তু। সুস্থ মানবিকতা মনষ্যত্ব স্নেহ প্রেম এ সব ও তাঁর কাচে সমান গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। উপন্যাস এ ছোট গল্পের ফর্ম নিয়েও তিনি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। বিশেষত ছোটগল্প য়ে আফরিক অর্থেই ছোট তার প্রমাণ ও তিনি রেখেছেন তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্পে। এগুলি অনুগল্প নামে বিশেষায়িত হয়েছে। পোস্টকার্ডের গল্প সত্যি সত্যিই পোস্টকার্ডের আয়তনে ধরে রাখার মত গল্প।

বনফুলের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সেগুলি হল -
বনফুলের গল্প বনফুলের আরোগল্প বিন্দু বিসর্গ বাহুল্য অদৃশ্য লোকে নবমঞ্জরী ,ঊর্মিমালা, অনুগামিনী রঙ্গনা সপ্তমী, মণিহারী এক ঝাঁক খঞ্জন ইত্যাদি।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বনফুল প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রতিভাবান লেখক। তাঁর সব্যসাচী প্রতিভায় বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁর সুবিপুল উপন্যাস সাহিত্য পৃথক আলোচনার বিষয় ,এখানে আমরা কেবল তাঁর শিল্পনৈপুণ্য ও সৃষ্টি শক্তির সূম্পকারুকার্যে বাংলা ছোটগল্পের শরীর কেমন ভাবে রত্ন মন্ডিত হয়ে উঠেছে তার পরিচয় টুকু নেব।

ছোটগল্প যে 'বনসাই' অথাৎ ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের ব্যঞ্জনা বনফুলের ছোটগল্পগুলির তার সার্থক দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন " বনফলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকাত আখ্যানের সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি তীক্ষ্ণ মননশীলতাও নানরুপ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়া মানবচরিত্রেরযাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে।'' পাশচাত্য সমালোচনায় কাব্য বা সাহিত্যকে বলা হয়েছে "irterpretation of life'' কিন্তু কবিত্বের প্রতি সহজাত শ্রদ্ধাশীলতা ও নিজের কবি প্রতিভার সৌজন্যে স্বয়ং বনফুল বলেছিলেন যে কাব হলপ্রকৃতপক্ষে"pocts interpretion of life'' সত্যি বলতে কি, বনফুলের অজস্র ছোটগল্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রয়েছে কবিতার অনির্দেশ্য ভাবব্যঞ্জনা ও " অনেক খানি ভাব মরে'' একটু খানি ভাষায় পরিণত হওয়ার মত কবিতার নিজস্ব শিল্পশৈলী। একথার সার্থক অভিব্যক্তি তাঁর মন্তব্যেই আমরা পাই যখন তিনি বলেন " সুখের সন্দানে যখন আমরা তোল পাড় করিয়া

বেড়াই, জ্ঞান বিজ্ঞান গুরু বন্ধু অর্থ সম্পদ কেহই যখন সুখের সন্ধান দিতে পারে না, তখন কবির কাছেই আমরা কেবল সুখের সন্ধান পাই। ''

বনফুলের ছোটগল্প আশ্চর্য রকমের ছোট ছোট আকারে রচিত অভিনব ছোটগল্প। ডঃ সুকুমার সেন সেজন্য বন ফুলের ছোটগল্পকে ইংরেজী সাহিত্যের "five minutes short story'' এবং আমেরিকার "short story'' এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ছোট কবিতার মতই বনফুলের চোটগল্প ভাবব্যঞ্জ নাময়। আমাদের পাঠ্য ছোটগল্প 'ছোটলোক' সেই গোত্রেরই একটি সার্থক দৃষ্টান্ত।

টিপ্পনী

কোন বিরাট তত্ত্ব আঙ্গিকের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল কিংবা মহনীয় চরিত্রের সুবিস্মৃত উত্থান পতন বা ঘাত সংঘাত 'ছোটলোক' গল্পে নেই এখানে আছে রৌদ্রতাপিত দ্বি প্রহরে আদি অকৃত্রিম মধ্যবিত্ত 'উন্নত মস্তক' , অন্যের অনুগ্রহ অপ্রত্যাশী রাঘব সরকারের সঙ্গে 'অস্থিচর্মসার ' এক রিক্সাওয়ালার পথ চলতি কিছু বাক্যালাপ, যে বাক্যালাপ আমাদের আটপৌরে জীবনের অজস্র প্রাত্যহিক অপচয়ের মতই মূল্যহীন বলে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু বনফুল সেই একমোটে বিবর্ণ বাক্ প্রতিমার উপর শিল্পীর জীবন্ত তুলির টান দিয়েছেন, ফলত সেখানে থমকে রয়েছে জীবনের এক মৌন প্রশ্ন। শিল্পীর সতর্ক তর্জনী উত্তোলনের গূঢ়র্থব্যঞ্জক ইঙ্গিতীট আমাদের ক্ষত বিক্ষত সমাজের বুকে আশ্রিত আত্মমর্যাদা ও সেই মর্যাদা অপহরণের দ্বন্ধকে ঘিরে আবর্তিত।

রাঘব সরকার বিত্তকৌলীন্যে সুসমৃদ্ধ নন। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণ, তীব্র আতপতা পদগ্ধ দ্বিপ্রহরে তাঁর মস্তক ছত্রহীন, পাদুকাযুগল জরাজীর্ণ এসব কিছুই চরিত্রটির মধ্যবিত্ত পরিচিতি টিকে সুস্পষ্ট করে তোলে। এই পরিচিতি আরও বেশী স্পষ্ট হয় তাঁর মধ্যবিত্ত সুলভ আদর্শবোধের আত্যন্তিকতায়, আত্মমর্যদাজ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় পরানুগ্রহগ্রহণের' নৈব নৈব চ' মানসিকতায় এবং সময় সুযোগ মত সীমিত সামর্থ্যে অন্যকে অনুগ্রহ প্রদর্শনের উদারতায়। মধ্যবিত্ত মানষ স্বাভাবে আদর্শবাদী এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞানে অপেক্ষাকৃত বেশী স্পর্শকাতর। এই আদর্শবাদ ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান তৈরীহয় বনেদী বংশধারা থেকে। কিন্তু একসময় সেই বনেদীয়ানায় ভাঙন ধরে, তবুও মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে চরিত্রের ঐ আভিজাত্য সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায় না।

মধ্যগগনের দীপ্ত সূর্যকে মাথায় করে গলদঘর্ম রাঘব সরকার পথ চলেছেন। ঠুন্ ঠুন্ ঘন্টা গাজিয়ে এক অস্থিচর্মসার রিক্সাওয়ালা তাঁর পিছু নিয়েছে " রিক্শা চাই বাবু রিক্শা ''

উন্নত মস্তিষ্ক রাঘব সরকার রিক্শা চাপাকে অমানবিক কাজ মনে করেন। তাঁর মতে রিক্সাওয়ালাকে অমানুবিক কষ্ট দিয়ে নিজের আরাম উপভোগ নিতান্ত গর্হিত কর্ম। দ্বিতীয়ত তিনি মনে করেন ন্যূনতম কষ্ট স্বীকার করে স্বাবলম্বী হতে শেখা। অকারণে পরনির্ভরশীল হয়া এক ধরণের অর্থহীন বিলাসিতামাত্র। অতএব অধ্যাবসায়ী রাঘব সরকার রিক্সাওয়ালার প্রস্তাব তৎক্ষণাত প্রত্যাখ্যান করলেন কিন্তু রিক্সাওয়ালা তাঁর পিছু ছাড়ল না। রাঘব সরকার তাঁর মধ্যবিত্ত জীবনের শিক্ষা অভিজ্ঞতা আর আত্মভিমানকে প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন য়ে সম্ভবত রিক্সা চালিয়েই ঐ লোকটির

সংসারের অন্ন সংস্থান হয়। এরই সূত্র ধরে ধনতন্ত্রবাদ বৈষম্যশীল সমাজ, শোষণ শাসন , সমাজের অবৈজ্ঞানিক শ্রমবিভাজন নীতি, এদেশের র্থনীতির ভগ্নদশা, কল কারখানায় শ্রমিক শোষণ সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জমিদারি শাসনের কুফল, শ্রমিক মুক্তির স্বপ্ন, বলশেভিক বিপ্লব ইত্যাকার তত্ত্ব কথা রাঘব সরকারের মনে উদিত হল এবং সামাজিক এই প্রতিকূলতায়

টিপ্পনী

একজন রিক্সাওয়ালার যাত্রী ধরার জন্য এই উঞ্ছবৃত্তিকে তিনি কিঞ্চিৎ করুণার দৃষ্টিতেই পর্যবেক্ষণ করলেন। মধ্যবিত্ত মানুষের এই ভাবোদয় নিঃসন্দেহে অকৃত্রিম ও অসাধু উদ্দেশ্য বর্জিত কিন্তু মধ্যদ্বিত্তের ক্ষমতা সীমিত সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণের বৃহত্তর যজ্ঞে তার বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার। এই সীমাবদ্ধতার কথা উপলদ্ধি করেই মধ্যবিত্ত ম্যুষ আসলে দাতব্যের উদারতা প্রদর্শন করে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দাতব্য দিয়ে সমাজের বৈষম্য ও দারিদ্র্য নামক ব্যাধি কখনই দূরীভূত হয় না।

রাঘব সরকারের দাতব্যকে রিক্সাওয়ালা পাছে ভিক্ষা ভেবে হীনম্মন্যতায় ভোগে কিংবা বিনা পরিশ্রমে পারিশ্রমিক প্রদান যুক্তিযুক্ত হবে না একথা বিবেচনা করে রাঘব সরকার তাঁর গন্তব্যস্থল পর্যনাত রিস্কা ভাড়ার কথা জেনে নিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বললেন তাঁকে অনুসরণ করতে। রিক্সাওয়ালার বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও রাঘব সরকার কিন্তু রিক্সায় উঠলেন না, বরং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া মেটাতে গেলে রিক্সাওয়ালা নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করল" আপনি চড়লেন কই? '' রাঘব সরকার তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন রিক্সা চড়াকে তিনি পাপ বলে মনে করেন। রাঘব সরকারের এই উত্তর রিক্সাওয়ালাকে ক্ষুদ্ধকরে তুলল তারও চোখে মুখে ফুটে উঠল রাঘব সরকারের প্রতি একপ্রকার অবজ্ঞা। রাঘব সরকারের এই ভাড়া মেটানের বদান্যতাকে সে উপেক্ষা করল মনুষ্যত্বের এক চিরন্তন অস্ত্র দিয়ে সেই অস্ত্র হল আত্মমর্যদাবোদের দুর্লভ অহমিকা। সেই অহমিকাই তাকে অঘাচিত দান গ্রহণকে ভিক্ষুকের চরম দীনতা বলে সতর্ক করে দিল। তাই সেই দরিদ্র অস্থিচর্মসার রিক্াসওয়ালাও নির্লোভ উচ্চারণ করল" আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষাগ্রহণ করি না। ''

রিক্সাওয়ালার এই দৃপ্ত উত্তর মধ্যবিত্ত মানসিকতার ক্ষুদ্র আত্ম সন্তুষ্টি উপভোগের উপর যেন এক কিঠিন চপেটাঘাত। আপাত দৃষ্টিতে রিক্সাওয়ালার পেশা বা

বৃত্তিতে সমাজ ছোটলোকের বৃত্তির তক্মা পরিয়ে রাখে। শ্রমবিভাজেনের নীতির মূল কথাটাই হওয়া উচিত সব রকমের শ্রমই সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু অভিজাত মানুষ চরম উন্নাসিকতায় বৃত্তির হীনতাকে বক্রদৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তার কাছে সৎবৃত্তিধারী মানুষ বিশেষত কায়িক শ্রমজীবী সৎ মানুষও ছোটলোক। এই ধারণা সম্ভবত রাঘব সরকারের মধ্যবিত্ত মানসিকতাতেও গেঁথে গিয়েছিল। সেজন্যতিনি দীন রিক্সাওয়ালার কাছে অন্তত এক দিনের জন্যও দেবদূত হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমান করার এই হীন প্রচেষ্টা সম্ভবত মানুষেরই মধ্যকার ক্ষুদ্র সত্তা বা 'ছোটলোক' সত্তাকে প্রকট করে তোলে। গল্পের নামকরণ 'ছোটলোক' হওয়ার পিছনে লেখকের এই মানসিকতাই কাজ করেছে বলে আমাদের ধারণা।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. ছোটগল্পের শিল্পসুষমা 'ছোটলোক' গল্পে কতখানি পরিস্ফুট হয়েছে আলোচনা করুন।

২. মধ্যচিত্তের ঠুন্কো আদর্শ ও অকারণ আত্মভিমানকে 'বনফুল' তার 'ছোটলোক' শীর্ষক গল্পে যে-ভাবে আঘাত করেছেন তার পরিচয় দিন।

৩. 'ছোটলোক' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৪. রাঘব সরকার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

৫. ছোটলোক গল্পের পরিণতি কতখানি শিল্পসম্মত হয়েছে বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. 'স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।'
কার কথা বলা হয়েছে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মস্তক উন্নত রাখার কি কি বিষয় গল্পে উল্লিখিত হয়েছে?

২. 'আহা সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট। হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।'
'লোকটা' কে? কার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হল? দয়ার সঞ্চার হওয়ার প্রকৃত কারণ কি?

৩. 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।'
'আমি' কে? কাকে একথা বলা হয়েছে? বক্তা কি জাতীয় 'ভিক্ষে'র কথা বলেছে? এই উক্তির দ্বারা বক্তা-চরিত্রের কোন্ দিকটি প্রতিভাত হয়েছে?

টিপ্পনী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)

সাহিত্য পরিচয় ও শিল্প মানসিকতা

'কল্লোল যুগ' এর অন্যতম কথাসাহিত্যিক হলেন অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসুকে কল্লোলের 'ত্রয়ী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যপর্ব থেকেই 'কল্লোল' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে একটা নতুনত্বের প্রবর্তন করেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেই সময় পর্ব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালেও নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চা করে গিয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সাহিত্য প্রতিভার গভীরত্ব লক্ষ্য করেছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্যতার কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পের স্রষ্টা অচিন্ত্যকুমার তাঁর অনেক রচনায় অনাবৃত দেহচেতনা ও কামনা বাসনার নগ্ন রুপকে ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু সেগুলি সাময়িকভাবে পাঠকের মনস্তুষ্টি করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে শিল্পের শাশ্বত মূল্য অর্জন করতে পারেনি। অচিন্ত্যকুমার রচিত বিবাহের চেয়ে বড়ো উপন্যাসটি একদা অশ্লীল সষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল 'বেদে,' 'আসমুদ্র,' 'ঊর্ণলাভ,' 'আকস্মিক,' 'কাকজ্যোৎস্না' 'প্রচ্ছদপট' ইত্যাদি। বেদে গল্প সংকলনের গল্পগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখকের মিথুন প্রকৃতির আধিক্যের কথা বলেছিলেন (১৩৩৫)।

ঔপন্যাসিক হিসেবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বহুল পরিচিতি ঘটলেও সাহিত্যজীবনের সূচনায় তিনি ছোটগল্পই রচনা করতেন। 'কল্লোল' 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকায় সেই গল্পগুলির নজির পাওয়া যাবে। সাহিত্যরচনার প্রথম পর্বে 'টুটা ফুটা' নামে তাঁর প্রথম গল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলি হল 'যতনবিবি,' ' কাঠ খড় কেরোসিন ,' 'কালোরক্ত, '' আসমান জমিন,' 'চাষ ভূষা,' 'সারেঙ,' 'হুইসল'।

যৌবনের উচ্ছ্বাস, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বাস্তব অভিঘাত, মূল্যবোধের রুপান্তর ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্য তাঁর ছোটগল্পে লক্ষিত হবে। ছোটগল্পের শিল্পসুষমা বিষয় বস্তুতে জীবনাভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যমন্ডিত প্রয়োগ এবং জীবন অন্বেষণ ও সমীক্ষণের দুর্লভ প্রয়াস এসমস্ত দিক থেকে অচিন্ত্যকুমারের কৃতিত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে জীবনের একটা বিরাটপর্ব জুড়ে তিনি হামসুন নীট্‌সে ফ্রয়েড প্রমুখ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গিয়ে কল্লোলযুগের উতরোল যৌবনেচ্ছ্বাসকে কামনার নীলরঙে ফেনিল করে তুলেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি কাম যৌন চেতনা দেহবাদ ইত্যাদির জগৎ থেকে অনেকখানি সরে এসেছিলেন।

টিপ্পনী

সারেঙ- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জীবনের কোনো অত্যুচ্চ সীমাস্পর্শী নাটকীয় ঘটনা দ্বন্দ্ব আততির মধ্য দিয়ে একতম কেন্দ্রীয় ভাবের উপর ভর করে যখন স্বল্প পরিসরে জীবনের এক গভীরতম সত্যকে স্পর্শ করে তখনই একটি সার্থক ছোটগল্পের জন্ম হয়। এক কিশোর বালক নাসিমের জীবন নাট্যের করুণ কাহিনী হল 'সারেঙ' ছোটগল্পটি যেখানে ছোটগল্পকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অদ্ভুত শিল্প কৌশলে মানবজীবনের এক বিরল বিড়ম্বনার সার্থক শিল্পরুপ দিয়েছেন।

অনাবিল আনন্দ উপভোগ, নবীন স্বপ্নরচনা এবং জীবনগঠনের যে প্রথম পাঠ কৈশোর বয়সে পিতামাতার স্নেহাশ্রয়ে নিজের গৃহাঙ্গনে সূচিত হয়, সেই বয়সে পিতৃহারা নাসিম এক ভগ্ন সংসারের স্নেহ মায়া মমতাহীন রুক্ষ পরিবেশের সম্মুখঈন হয়েছে। গল্পের সূচনাই হয়েছে এই বাক্যটি দিয়ে "মানসিমকে মেরেছে"। শুধু মা নয়, আরো কেই নাসিমকে মেরেছে, কিন্তু নাসিমের প্রশ্ন "ও মারবে কেন?"

এই 'ও' গহরালি গহরালি "মস্ত লোক। জমি আছে পাঁচ কানি। কাচারি আছে দরজায়। দায়েরি মোকদ্দমা আছে কনম্বরে।" নাসিমের মা গোলবানু বলে "ওকে ধরলে জমি জায়গা ঠিক থাকবে খাওন পিরনের কষ্ট থাকবে না খড় কুটার বদলে ঢেউ টিনের ঘর উঠবে একদিন।" তাই গোলবানু গহরালিকে নিকা করতে চায়। এর বিরুদ্ধেই নাসিমের দৃপ্ত প্রতিবাদ "চাইনা আমাদের এই ভাঙা ঘরই ভালো। আমরা শাক লতা খেয়ে থাকব। তুই ওকে তাড়িয়ে দে।" আত্মমর্যাদার এই পরাকাষ্ঠা সংসার সহ্য করেনা, তাই গহরালির হাতে নাসিমকে মার খেতে হয়, গোলবানুও তাতেহাত মেলায়।

নাসিমের স্বপ্ন ছিল দরিয়ায় নৌকো ভাসানোর, নদীতে জাল ফেলার। কিন্তু বাপের মৃত্যু তার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আর সংসারের প্রতি তার বিস্বাদ জন্মেছে। নাসিম বুঝতে পেরেছে সে যখন 'নিজগৃহে পরবাসী।' তার নিজস্ব পিতৃপরিচয়ও গহরালি ঢেকে দেবে , তাকে হতে হবে গহরালির আশ্রিত। আত্মমর্যাদাবোধের এই তাড়না থেকেই নাসিম একদিন গৃহত্যাগ করে সকলের অজ্ঞাতসারে এক জাহাজে উঠে পড়ে। সরাসরি সারেঙের কাছে গিয়ে বলে হুজুরের যদি চাকরের দরকার থাকে আমাকে রাখতে পারেন। তারপর থেকে বিনা মাইনের চাকর হয়ে নাসিমের জীবনের নতুন পর্ভ শুরু হয়। নাসিমের তখন পরিচয় 'মুফৎ একটা ছোকরা' জাহজের ফাই ফরমাশ খাটার কাজে তার প্রয়োজন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

জাহাজের নিয়মকানুন, সেখানকার কাজকারবার, জীবনযাত্রা ভাঙার মানুষের জীবনযাত্রার চেয়ে একবারে আলাদা। নাসিম লক্ষ্য করে জাহাজে সারেঙের কি ভয়ানক দাপট। সিঁড়িওয়ালা,

পাটাতনওয়ালা, লাইটওয়ালা, মেস্তরি, কয়লাওয়ালা, ইঞ্জিনওয়ালা সবাই সারেঙের ভয়ে তটস্থ সামান্য ভুলের জন্য প্রায় প্রত্যেকের কপালে মার জোটে জমিদারের দাপটওয়ালা সারেঙের হাতে। নাসিম দেখে , কর্মচারীর মার খায়, কিন্তু প্রতিবাদ করেনা, টুঁ শব্দটি করেনা। সারেঙের বিরুদ্ধাচরণ করলেই কাজ থেকে বরখাস্ত বাঁধা ব্যাপার। অন্য জাহাজের তাদের কাঝ জুটবেনা, কারণ দরিয়ার বুকে সব ইস্টীমারের সারেঙরা এক কাট্টা কারও কর্মচারীকেই কেউ রেয়াত করেনা। একদিন কাঁচের বাসন ভাঙার অপরাধে নাসিমও সারেঙের হাতে বেধড়ক মার খেল। সারেঙ ইস্টিমারের সর্বময় কর্তা, "জাহাজের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সে।" কোম্পানী শুধু সারেঙকে চেনে, পথ চলতি কোন ক্ষয়ক্ষতির দায় কেবল সারেঙেরই । ঝড়তুফানের হাত থেকে ইস্টিমারকে বাঁচিয়ে তীরে ভেড়ানোর কৃতিত্বও কোম্পানী সারেঙকেই দেয় তার ভাগ্যেই জোটে যত মেডেল কিংবা বা পুরস্কারের অর্থ।

টিপ্পনী

চোরা চরে এসে ইস্টিমার একদিন আটকে যায় ইস্টিমার চালু করতে ঝক্কি অনেক। দোষ গিয়ে পড়ে শুখানির, সেকেন্ড মোটর উপর। তাদের পুরো মাসের বেতন হয়ে যাবে বন্ধ , কারণ সারেঙ "এই জাহাজের ইজরাদার মোকররী ইজারা।" জাহাজ চালানোর খরচ, সরজ্জামের খরচ বেতন সমস্ত টাকা কোম্পানী এক লপ্তে সারেঙের হাতে তুলে দেয় সারেঙ তারপর একনায়কত্ব চালায়। ফাকে খুশী মাইনে দেয়, মাইনে কাটে জরিমানা করে সারেঙের বিরুদ্ধে নালিশ করার অধিকার কারও নেই।

ইস্টিমারের কর্মচারীরা পশুর মত মুখবুঁজে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে, আর স্বপ্ন দেখে এই অত্যাচার সহ্য করার পুরস্কারস্বরুপ একদিন তাদের পদোন্নতি হবে, হয়তো সারেঙ পদেও নিযুক্তি হতে পারে তাদের। কিন্তু সারেঙগিরির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সাহেবের সার্টিফিকেট দরকার সুতরাং সারেঙের পদসেবা করা ছাড়া কর্মচারীদের গত্যন্তর থাকেনা। সিঁড়িওয়ালা থেকে 'ফানিলে'ফাইন্যাল ওঠার অসম্ভব স্বপ্ন দেখে তারা। জাহাজ থেকে পালালে চুরির মিথ্যে অভিযোগে হাজতবাস নিশ্চিত জাহাজের কর্মচারীদের জীবন এমনিভাবে অসহায় বন্দীদশায় তিলে তিলে শেষ হয়ে যায়।

নাসিমও ভাবে তার জীবন পরিণতির কথা। জাহাজের একই পথে একঘেয়ে যাওয়া আসা নাসিমকে কোন নতুন জীবনের সন্ধান দেয়না। জাহাজের যাত্রীদের সেই গোলমাল, একটান জলের শব্দে, নোঙর ওঠানামার হড়হড় শব্দে এক বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দ জীবন নাসিমের মনকে বিস্বাদ করে তোলে। মাঝরাতে জাহাজ যখন নাসিমর গ্রাম কনকদিয়ায় পৌঁছায় তখন নাসিমের মনে পড়ে গ্রাম ঘরের কথা। কিন্তু নাসিম এখন বাস্তুহীন, মায়ের মুখ ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে , কিন্তু নাসিমের মনে হয়। বেঁচে থেকেও মা তার মৃত , আর তখনই "মার মরা মুখের মতোই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।"

জাহাজের কোন এক কর্মচারী একদিন ফিসফিসিয়ে বলেছিল সারেঙের মন পেতে হলে সারেঙের জন্য চুরি করতে হবে। নাসিম নানান কৌশলে সারেঙকে খুশী করার কাজে লেগে পড়ল। ভাবওয়ালাকে কম পয়সা দিয়ে, মাছওয়ালা দুধওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে সারেঙের মনস্তুষ্টি করে চলল সে। কিন্তু সারেঙ স্বার্থপর মন বলে কোন পদার্থ তার নেই, নিদেকে ছাড়া পৃথিবীর সবাই কে তার ক্রীতদাস বলে মনে হয়। নাসিম একদিন সারেঙের কাছে চা খাওয়ার জন্য চারটে পয়সা চাইলে সারেঙ সেটাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জঘন্য অপরাধ জ্ঞান করে তার গালে 'বিরাশি

সিক্কা ওজনের চড়' বসিয়ে দিল। নাসিমের মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। নাসিম তবুও জাহাজের আর পাঁচটা লোকের মত এই ভয়ংকর সারেঙকে কি ভাবে খুশী করা যায় তা নিয়ে নিরন্তর গবেষনা চালিয়ে যায়। একপ্যাসেঞ্জারের জুতো চুরি করে সারেঙকে দিতে গেলে সেই জুতো জোড়া সারেঙ ছুঁড়ে ফেলল নদীর গহবরে , একটা টিনের সুটকেশেরও একই অবস্থা হল। কিন্তু নাসিম মনে মনে ভাবে সে একদিন পারবেই সারেঙের মন জয় করতে। ছোটখাটো চুরি তাই চলতে ই থাকে, কিন্তু গরীর প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে দামী কিছু পাওয়ার আশা নিতান্তই কম। তবু এরি মধ্যে সুযোগ খুঁজে চলে নাসিম।

টিপ্পনী

সুযোগ আসে। 'নতুন বউ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি গলায় সোনার হাসনা হাতে বটফুল' পায়ে রুপোর খাড়ু , আঙুলে ওজরি। ফলসারঙের শাড়ি পরে ঘোমটা টেনে ঘুমিয়ে আছে একপাশে সেই নতুন বউয়ের গলার হার একটানে ছিঁড়ে ফেলল নাসিম , ধরা পড়ল, মার খেল প্রচন্ড। সারেঙ নীচে নেমে এসে সব বৃত্তান্ত শুনল এবং নিজের পুত্র পরিচয়ে নাসিমকে পারচায়িত করে তার ঘাড় থেকে চুরির দায় ঝেড়ে ফেলার ব্যবস্থা করে দিল। নতুন বউ সাক্ষ্য দিল যে ঘুমের ঘোরে হার আপনি খসে পড়েছিল। জাহাজ তীরে নোঙর করল। সকলকে অবাক করে দিয়ে সারেঙ নাসিমের পদোন্নতি ঘটালো সিঁড়িওয়ালায় নতুন বউকে লগি ধরে শরীরের চাল সামালানোর পরামর্শ দিল নাসিম, সেই মুহূর্তে কারও ধাক্কায় সচকিত হয়ে নাসিম দেখল সে গহরালি হার চুরির জন্য সে তাকে সবচেয়ে বেশী মেরেছিল। নাসিম ঘোমটাটানা আত্মগোপনশীলা গোলাবানুকে চলে যেতে দেখল গোলবানু তার মা কিন্তু এই মুহূর্তে সেই মা মৃত ঘোলাটে জলের ছায়ায় নাসিম দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ।

আশ্রিত জনকে পুত্রপরিচয়ে পরিচায়িত করে সূর্য্যের মত আলোকউদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সারেঙ আর গোলবানু গর্ভধারিণী জননী হয়েও সামুখে দন্ডায়মান দুর্ভাগ্য বিধ্বস্ত পুত্রের দিকে বাড়িয়ে দিতে পারেনি স্নেহহস্ত , গহরালির সঙ্গে ভোগসুখের নতুন জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা আপন আত্মজকে পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অপরিচিত মানষে রুপান্তরিত করেছে। অন্যদিকে সারেঙ চরিত্রটিও শেষ পর্যন্ত আমাদের কাচে রহস্য ময়ই থেকে যায়।

সারেঙ তার দ্বৈত সত্তা (?)

আমাদের পরিচিত জীবন ও সমাজ পটভূমিকার বাইরে জলখাল স্টীমারের বুকে নিত্য ধটে যাওয়া জীবনচর্যার এক অদেখা দিককে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'সারেঙ' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সারেঙ' গল্পসংকলনের প্রথম গল্পটিই হল 'সারেঙ'।

ফার্সী শব্দ 'সর্হঙ্গ্' থেকে 'সারেঙ' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। এর আভিধানিক অর্থ নদীগামী বা সমুদ্রগামী স্টীমার বা জাহাজের প্রধান মাঝি, মাল্লা বা পরিচালক। জাহাজ বা স্টীমারের সর্বেসর্বা কর্তা হল সারেঙ। তার নির্দেশ আদেশ এবং পরিচালনাগত নিয়মনীতি সকল তর্ক বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

সেই রকমই এক সারেঙ চরিত্র আলোচ্য গল্পের কেন্দ্র বিন্দুতে অধিষ্ঠিত। সারেঙ নিজের উচ্চপদ সম্পর্কে অতিসচেতন। সে স্বার্থপর , আত্মকেন্দ্রিক মায়া মমতাশূন্য নিষ্ঠুরহৃদয় এবং অন্যের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা সম্পর্কে আশ্চর্যরকমের উদাসীন। কর্মচারীদের উপর শারীরিক পীড়ন চালানোকে সে তার অধিকার বলে মনে করে এবং এতে সে একজাতীয় আদিম উল্লাস

অনুভব করে। সকলকে পদানত করে রাখাটা তার স্বভাবের মৌল বৈশিষ্ট্য। অল্পবয়সী কিশোরচরিত্র নাসিমও তার অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়না। ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে থাকাটা তার কাছে নেশার মত। কর্মচারীরা তার ক্রীতদাস এরকম ভাবনাই তার মধ্যে ক্রিয়াশীল। গল্পকারের ভাষায় "সমস্ত ইস্টিমার তাই সারেঙের কথায় ওঠে বসে। সব কর্মচারী তার তাঁবেদার । ইস্টিমার তো নয়, যেন সে লাটদারি পেয়েছে।"

চরিত্রটির মধ্যে সততাও দৃষ্ট হয় না। সারেঙ অর্থলোভী। কারণে অকাবনে কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া জরিমানা করা। এমনকি চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া ইত্যাদিকে সে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে করে। স্টীমার চালানোর খরচ বাবদ কোম্পানী প্রদত্ত পর্যাপ্ত অর্থ সে যথা বিহিত ব্যয় করে না, বরং আত্মসাৎ করে গল্পের ঘটনায় লেখক এমন ইঙ্গিতও প্রদান করেছেন।

টিপ্পনী

সারেঙ স্বাভাবে কর্মে অত্যন্ত অসহিষ্ণু প্রকৃতির। অন্যের মতামত তার কাছে অর্থহীন ও অনধিকার চর্চার তুল্য। প্রতিবাদতার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে যেন।

সারেঙ স্তাবকতা পছন্দ করে। জাহাজের লোকজন সারেঙের মন পাওয়ার জন্য অবিরত খুশী করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। শত অত্যাচার অবিচার এবং অপমান সত্ত্বেও তাদের চাটুকারিতায় কখনো ভাঁটা পড়ে না। ছোট নাসিমও এ সত্য উপলব্ধি করেছে। তার কানেও গিয়েছে জাহাজী জীবনের সারসত্য কথা "সাহেবকে খুশি করতে চেষ্টা কর তা ছাড়া আর পথ নেই।"

মালিক এবং দাসের বৈষম্যমূলক সম্পর্কেরই টানাপোড়েন যেন 'সারেঙ' গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। কিন্তু গল্পের উপসংহারে এসে সারেঙ চরিত্রের মধ্যে এক আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা যায়। সারেঙ এর পারিবারিক জীবন কিংবা তার ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা বা অপূর্ণতার কোন আভাস বা ইঙ্গিত গল্পকার এখানে দেননি, কিন্তু সারঙের অন্তরের অন্তস্তলে সুপ্ত ছিল যে অপত্যস্নেহ এবং পিতৃত্বের আবেগ নাসিমের জীবনের এক চরম দুঃখভোগের দিনে তা যেন সহসা প্রবল জীবনাবেগে জেগে উঠেছে নাসিমের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করেছে আপন সন্তানের প্রতিমূর্তি। সেদিক থেকে বিচার করলে এই সারেঙ সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। আবার অন্যদিক থেকেও বিষয়টি বিচার করে দেখা যেতে পারে। যে সারেঙ স্বভাব ও প্রকৃতিগত দিক থেকে মায়া মমতাহীন একজন স্বৈরাচারী মানুষ তার এই হঠাৎ পরিবর্তন কোন খামখেয়ালিপ্রসূত নয় তো? হয়তো সারেঙের মনে হয়েছিল তাকে খুশী করার জন্যই নাসিমের এই চৌর্যবৃত্তি এবং ধরাপড়ে নিগ্রহ ভোগ সেই মুহূর্তে তাই সারেঙ পিতৃত্বের দোহাই দিয়ে হয়ে উঠেছিল নাসিমের ত্রাণকর্তা। আর নাসিমের সিঁড়ি ওয়ালায় পদোন্নতি হয়তো বা সারেঙের ক্ষমতা প্রদর্শনের এক বিনাসী প্রয়াস। জাহাজের লোকজনের কাছে সেটা এমনই এক 'চেতাবনি' যার অর্থ যোগ্যতা নয় হঠাৎ কোন একদিনের যুক্তিহীন মর্জির সরু সুতোয় তাদের পদোন্নতি ভাগ্য ঝুলে রয়েছে। সারেঙ সকলের ভাগ্যবিধাতা গল্পের সমাপ্তিসূচক বাক্যটি সারেঙের সেই স্বরুপটিকেই ফুটিয়ে তোলে "দিনরাত করে যে সূয্যি যেন তার মতো চেহারা।"

ছোটগল্পের সমাপ্তি থাকে অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা সেই ব্যঞ্জনার্থের কথা মনে রেখেই সারেঙ চরিত্রের দ্বিতীয় রুপটি পাঠকের মনে উঁকি দিতে পারে।

১. ছোটগল্প হিসেবে 'সারেঙ'সার্থক কিনা বিচার করুন।

২. ‘সারেঙ’ ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সারেঙের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে যে দিক আপনাকে আকৃষ্ট করে সেগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৩. নাসিম কিশোর চরিত্র হলেও ‘সারেঙ’ছোটগল্পের সে একটি আক,নীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

৪. ‘সারেঙ’ছোটগল্পটির অন্তর্ভুক্ত অপ্রধান চরিত্রগুলির জীবন সমস্যা ও অসহায়তার কথা মূলগল্পানুসরণে লিপিবদ্ধ করুন।

টিপ্পনী

৫. ‘সারেঙ’ছোটগল্পটির সমাপ্তি নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি বিশদ করুন।

৬. ‘সারেঙ’ ছোটগল্পটির কাহিনী বিন্যাস ও গঠনশৈলী সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত দিন।

১. ‘ওকে ধরলে জমি জায়গা ঠিক থাকবে, খাওন পিরনের কষ্ট থাকবে না, খড় কুটার বদলে ঢেউ টিনের ঘর উঠবে একদিন।’
কে, কাকে একথা বলেছে? একথা বলার কারণ কি? যার প্রতি এই উক্তি তার মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

২. ‘বুকের ভেতরটা জ্বলতে থাকে নাসিমের।’
নাসিম কে? তার বুকের জ্বলুনির কারণ কি? এর জন্য সে কি করেছিল?

৩. ‘অজানার টানে যে ভাসতে পেরেছে অকূলে এই তার মহাসুখ।’
কার সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে? কে কি জন্য অকূলে ভেসেছে? তার ‘মহাসুখের’পরিচয় দিন।

৪. ‘কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। এই এখানকার রেওয়াজ।’
প্রসঙ্গসহ উদ্ধৃত অংশটির বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৫. ‘ইস্টিমার তো নয়, যেন সে লাটদারি পেয়েছে।’
‘সে’কে? ‘লাটদারি’কি? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে একথা কেন বলা হয়েছে?

৬. ‘সাহেবের সুদৃষ্টি না হলে কিছুই হবার নেই।’
‘সাহেব’কে? তার সুদৃষ্টি হলে কি হওয়ার সম্ভাবনা? সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য কারা, কি করে?

৭. ‘আর পালিয়ে যাওয়া সোজা নয়।’
কাদের কোথা থেকে পালানোর কথা বলা হয়েছে? পালিয়ে যাওয়া সোজা নয় কেন?

৮. ‘এমন স্পর্ধার কথা সারেঙ তারজীবনে শোনেনি।’
কে স্পর্ধার কথা বলেছে? স্পর্ধার কথাটি কি? সারেঙ কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল?

৯. ‘পারবি ,পারবি, আস্তে আস্তে পারবি।’
কথাগুলি কোন্ প্রসঙ্গে এসেছে? উদ্ধৃতাংশটির অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

১০. 'আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে গোলবানু।'
গোলবানু কে? আলোথেকে তার মুখ সরানোর কারণ কি? চরিত্রটি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হয়?

১১. 'পাড়ের কাহেকার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ।'
কে দেখতে লাগল? তার মা কে? মায়ের মরা মুখ বলতে আপনি কি বোঝেন?

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২খ্রীঃ- ১৯৮২ খ্রীঃ)

টিপ্পনী

উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার সব্যসাচী প্রতিভা নিয়ে বাংলা কথা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আবির্ভাব ঘটেছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্দ্রশিষ্য'। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত অন্তর্মুখী এবং চিন্তাশীল। মানবজীবন এবং প্রকৃতি এই উভয়ের মেলবন্ধন তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রায় ক্ষেতেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কর্মজীবন কেটেছিল বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে। ছবি আঁকা এবং কবিতা লেখায় তাঁর উৎসাহ ছিল কিন্তু শেষত কথা সাহিত্যেই তিনি তাঁর শিল্পীমনের মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় লেখক হওয়ার। 'নবশক্তি' 'পূর্বাশা' 'দেশ' 'চতুরঙ্গ' ভারতবর্ষ পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁকে সাহিত্য রচনায় সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহিত করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী খুব জনপ্রিয় লেখক কোন দিন ছিলেন না কিন্তু সাহিত্য প্রতিভা ছিল তাঁর যতেষ্ট। তিনি অন্তত তিপান্নটি উপন্যাসের রচয়িতা এদের মধ্যে 'মীরার দুপুর' 'বারোঘর এক উঠোন' 'আততায়ী' 'শেষ বিচার' বহু আলোচিত ও বহুপঠিত উপন্যাস।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সঠিক অর্থে বাস্তববাদী লেখক ছিলেন না। সমাজ বা বিশেষ শ্রেণী সম্পর্কে আগ্রহের পরিবর্তে তিনি ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্লোক উন্মোচন কার্যেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন "পূর্ব সূরীদের সাহিত্যে যথাযথ তৃপ্তি আমি পাইনি, যেন আরো কি দেবার রয়ে গেছে। তা দিতে হবে আমাদের তাই আমার সাহিত্য মঞ্চে প্রবেশ।" এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের অভাব মোচনের লক্ষ্য নিয়েই তিনি সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

উপন্যাস সাহিত্য বাদ দিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়ায় সতেরো। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'খেলনা' ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল 'চন্দ্রমল্লিকা' ১৩৫৩ শালিক কি চড়ুই ১৩৬১ নায়ক নায়িকা খুকী, চড়ুই ভাতি, বধির, ভোলাবাবুর ভুল, খেলোয়াড়, চামচ, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, চার ইয়ার ১৩৬১ বন্ধুপত্নী ১৩৬২ ট্যাক্সিওয়ালা ১৩৬৩ বনানীর প্রেম ১৩৬৪, প্রিয় অপ্রিয় ১৩৬৪, পতঙ্গ ১৩৬৭, শ্বাপদ শয়তান ও রুপালী মাছেরা ১৩৭০, ছিদ্র ১৩৮৩ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এক বিপন্ন সময়ের লেখক হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। দেশভাগ মন্বন্তর উদ্বাস্ত সমস্যা অর্থনৈতিক ভগ্নদশা বেকারত্ব কালোবাজার এই অবক্ষায়িত যুগের মানুষের বিশেষত মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যা আক্রান্ত বিপর্যস্ত অবস্থার চিত্র তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। অবক্ষয় ও বিপন্নতার মাঝে তিনি খুঁজতে চেষ্টা করেছেন আশাবাদ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও সৌন্দর্যমন্ডিত মানবমন। প্রকৃতিকে তিনি নিয়ে এসেছেন মানব জীবনের

কাছা কাছি। ৬ অরুণকুমার মখোপাধ্যায় ছোটগল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন " সমরোত্তর পর্বের বাংলা ছোটগল্পের সবচেয়ে নিন্দিত ও প্রশংসিত লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এক অর্তে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী। মোহমুক্ত নিরাসক্ত নির্যম সমাজ দৃষ্টি তাঁর আছে। চিন্তায় তিনি মননর্ধমী উপস্থাপনে চাপা বিদ্ধপাত্মক ভঙ্গি শব্দ ও বাক্যরচনায় একান্তভাবে স্বকীয় বলা উচিত তাঁর ভাষাররীতি দ্বিতীয়রহিত। মাণিকের মতো তিনি রাজনীতি সমাজনীতি সচেতন শিল্পী নন। বরং ব্যক্তি জীবনে ও সাহিত্যজীবনে তিনি ইনট্রোভর্ট বাস্তব দৃশ্য ছাড়িয়ে অন্তর্লোকে জ্যোতিরিন্দ্রর উত্তাপ।"

টিপ্পনী

চোর-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সাহিত্যরসভিত্তিক আলোচনা

বাহ্য ঘটনাকে আশ্রয় করে চরিত্রের অন্তর্লোকে ঢুকে গিয়ে জীবনেরমূল্যবোধ অনুসন্ধান করতে ভালোবাসেন ছোটগল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। সংসারে রয়েছে বিচিত্র মানুষের ভীড়। ভালো মন্দ ধার্মিক অধার্মিক , স্বার্থপর নিঃস্বার্থ , ত্যাগী, ভোগী মনুষ্যবিদ্বেষী ও মানবপ্রেমী নানা ধরণের মানুষ নিয়ে মানবের মহাজীবন। প্রাত্যহিক জীবনচর্যার হাজারো টানাপোড়েনে মানবচরিত্রেরা মথিত বিমথিত হয়, আর জীবন মন্থনের ফলশ্রুতি হিসেবেই মানব চরিত্রের অন্তর্মূল থেকে কখনো বেরিয়ে আসে অমৃত কখনও জ্বালাময়ী প্রাণঘাতী গরল। বড় বড় ঘটনায় নয়, ছোট ছোট ঘটনার নাড়া লেগে জীবনের বিচিত্র অথচ একান্ত চিত্রগুলি দৃশ্যমনে হয় আমাদের সামনে। নিতান্ত তুচ্ছ একটি ঘটনাকে আশ্রয় করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর 'চোর'শীর্ষক ছোট গল্পেও ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের এক তাৎপর্যমন্ডিত সত্যকে।

একটি বালক 'চোর' গল্পের কথক চরিত্র। নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ছা পোষা পরিবারের সন্তান সে। স্বভাবে সহজ সরল সংসারের সকলের প্রতি সে সমব্যথী। " ছোট উঠোন, টালির ঘর, কোরোসিনের আলো টিমটিমে ঠান্ডা সংসার" এসবের সঙ্গেই সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে চমৎকার। সেই বাড়ির সঙ্গেই এক চিল্‌তে ফাঁকা জায়গা যার পাশে এক বিরাট যজ্ঞ ডুমুর গাছ দন্ডায়মান। অনুর্বর মাটি আর যজ্ঞ ডুমুরের ছায়ায় ভাঁটা বা ধনের চারা শুকিয়ে সেখানে খড়কে কাঠির মত হয়ে যায়। সেই মাটিতেই বালক কথক সযত্নে একটি পেঁপের চারা পোঁতে। আর সেদিনই বাড়িতে এসে হাজির হয় পাশের বড় লোকদের বাড়ি থেকে ছাঁটাই হওয়া কথকেরই সমবয়সী রোগা ক্ষয়াটে চেহারার চাকর মদন। মদনের কাজ থেকে বরখাস্ত হওয়া আর মলিন চেহারা বালক কথককে তার প্রতি সহানুভতিশীল করে তুলল। তাদের অভাবের সংসারে নতুন অতিথির আগমনও ঘটেছে তখন। শিশু কন্যার পরিচর্যায় ব্যস্ত শল্পের কথক চরিত্রের মা মদনের দুঃখের কাহিনী শুনে বিগলিত হলেন স্বামীর আগমনের পর স্থির হল মদন খাওয়া দাওয়া ও তিন টাকা মাইনেতে সংসারের কাজকর্ম করবে। ঘটনা সামান্য কিন্তু যেটি লক্ষ্য করার মত ঘটনা তা হল অভাবের সংসারে প্রত্যেকেই পরদুঃখকাতর সহানুভূতিশীল এবং একান্তভাবেই মানবিক। মদনও অল্পদিনের মধ্যেই ঐপরিবারটির সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল। অসাধারণ কর্মদক্ষতায় ও আন্তরিক সেবায় সে হয়ে উঠল ঐ বাড়িরই একজন সদস্য। কিন্তু মদন মনে প্রাণে পূর্ব মানিববাড়ির প্রতি বিরুপমনোভাব পোষণ করে। এবং তাদের ক্ষতি করার জন্য বালক কথক চরিত্রটির সঙ্গে নানান ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। ইত্যবসরে বাগানের পেঁপে চারাটি নধর হয়ে উঠে

নতুন পাতা ছেড়েছে মদন সযত্নে গরু ছাগলেরহাত চারাটিকে রক্ষা করার জন্য যজ্ঞ ডুমুরের ডাল কেটে নিখুঁত হাতে বেড়া দিয়েছে।

এ পর্যন্ত গল্পের বিস্তার প্রায় সরলরৈখিক। তারপরই ঘটনা চরম আকস্মিক তায় মোড় নিয়েছে এমন একদিকে যেখান থেকে সামান্য গৃহস্থালীর সাদামাটা কাহিনী পাটককে এক অপ্রত্যাশিত জীবনসত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে। একদা মনিবের প্রতি অতি বিরক্ত মদন এক বর্ষার দিনে ইচ্ছা কৃত ভাবে মনিবের ছেলে সুকুমারের ধোপ দুরস্ত স্কুলের পোশাক রাস্তার কাদাজলে মাখামাখি করে দেয় এবং ভৃত্য ভূষণের হাতে সে ধরা পড়লে তাকে সুকুমারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। মদনকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে এই আশঙ্কায় যখন গল্প কথকের বাড়ির লোকজন চিন্তাগ্রস্ত তখন নাটকীয় ভাবে জানা যায় মদন পুনরায় ঐ বাড়িতে কাজে বহাল হয়েছে। মদনের আনন্দ বিগলিত ব্যবহার পুরোনো মনিববাড়ির প্রতি ক্ষোভহীন আনুগত্য এবং এক মুহূর্তে গল্পকথকের বাড়ির স্নেহ ভালোবাসা এবং আশ্রয়হীনতার দিনে তাকে সস্নেহে আশ্রয় দেওয়ার মানবিকতাকে নস্যাৎ করে দেওয়া মানচরিত্রে এই রহস্যাময় ব্যাপার গল্পের মধ্যে দিয়ে আসে মানুষের স্বরুপ সম্পর্কে এক ঝাঁক জিজ্ঞাসা।

গল্পটি তার অন্বিষ্ট বক্তব্য পৌঁছে যায় যখন ঘটনাচক্রে সুকুমারের সঙ্গে গল্পখথকের বন্ধুত্ব আকস্মিক ভাবে গাঢ়তর হয়ে ওঠে। সুকুমারদের বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়া সুকুমারের মায়ের স্বাস্থবতী রুপ নিরীক্ষণ করা তাঁর দেওয়া লোভনীয় খাবার খাওয়া এবং সর্বোপরি সুকমাদের ভরাট বাগান ঘুরে ঘুরে দেখা যখন গল্পকথকের একটা নেশা বা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তখনই গল্পকথক আবিস্কার করে এক বর্ষার রাতে তার নধর পেঁপে গাছের চারাটির চুরি খাওয়ার মূল হোতা হল মদন, যেটি তখন সুকুমারেদের বাগানে ফলে ফুলে সমৃদ্ধ একটি পূর্ণগাছ।

বালক গল্পকথক এই একটি মাত্র ঘটনায় মানবচরিত্রের কৃতজ্ঞতা অকৃতজঋতার হিসেব নিকেশ করার পরিবর্তে অন্য একটি আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়েউঠল। তার মনে হল " মদন পেঁপে চারাটা চুরি করে নিয়ে যায়নি। আমার বারবার মনে হচ্ছিল পেঁপেচারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেক চুরি করে নিয়ে গেছে। কেবল মদনকে নয় আমাকেও না হলে আমাদের ছোট উঠোন টিনের ঘর ছায়া ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।"

নিজের অস্তিত্ব যে ভূমির উপর দৃঢ়লগ্ন সেই ভূমিকে উপেক্ষা করা অমার্জনীয় অপরাধ শুধু অপরাধ নয়, অকৃতজ্ঞতা। সেই অপরাধ বোধই গল্পকথকের সরল মনে অনুশোচনার তীব্র দহন সৃষ্টি করেছে। মদনের ছেড়ে যাওয়ার পিছনে ছিল বাড়তি অর্থের লোভ, ধনীগৃহের ভালোমন্দ খাওয়ার লোভ হয়তো বা ধনীমনিবের ভৃত্য বলে পরিচয় দেওয়ার লোভ কিন্তু আত্মবিস্মৃতির যে ছিদ্রপথে গল্প কথকের মনে ধনীর সান্নিধ্যলাভের লোভ জেগে উঠেছিল, তা তো মানবমনের একটি ব্যাধিবিশেষ মূল্যবোধের অবক্ষয়। এই অবক্ষয়ের কিনারায় দাঁড়িয়েই গল্পকথক আবার তার নিজস্ব বৃত্তে ফিরে এসেছে। বস্তুত বোধোদয়ই মানুষকে মূল্যবোধের কাছে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসে।

'চোর' গল্পের উপসংহারে এসে মনে প্রশ্ন জাগে এই গল্পে চোর কে? মদন? বাহ্য অর্থে অবশ্যই মদন।
কিন্তু ব্যঞ্জনার্থে ? পেঁপেগাছ।

টিপ্পনী

পেঁপে গাছই মদনকে চুরি করেছে আর তার চৌর্যবৃত্তির হাতটাকে প্রসারিত করেছে সরলমতি বালকটির দিকে।

১. 'চোর' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

২. 'চোর' গল্পের কাহিনী বিশ্লেষণ করে এখানে প্রকৃষ্ণ চোর কে নির্দেশ করুন।

৩. একটি সামান্য ঘটনাকে ছোটগল্পের শিল্পব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলার অসামান্য দৃষ্টান্ত 'চোর' গল্পটি বিশ্লেষণ করুন।

টিপ্পনী

৪. 'চোর' গল্পটির ঘটনাধারায় সামাজিক আভিজাত্য বিত্তশালিতা এবং এক প্রকার শক্তিদম্ভ খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করে গিয়েছে মন্তব্যটির সত্যতা বিচার করুন।

৫. 'চোর' গল্পের মদন চরিত্রটি আপাতবিচারে অকৃতজ্ঞ বলেই বিবেচিত হবে কিন্তু মদনের পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয় মন্ত্যটির পক্ষে অথবা বিপক্ষেআপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

১. 'সেখানে আর অন্য কিছু চারা বা গাছ মাথা তুলতে সাহস পায়না।'
'সেখানে'– কোথায়? জায়গাটির বর্ণনা দিন।

২. 'একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ওর ঠোঁটের ধারে উঁকি দেয়।'
কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে? তার ঠোঁটের ধারে সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে ওঠার কারণ নির্দেশ করুন।

৩. "একজনেরটা খেয়ে এসে নিন্দে করতে নেই – বলে, যার নুন খাব তার গুণ গাব নিন্দে করা পাপ। কে কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছেন? এর মধ্যে বক্তা চরিত্রের কোন্ দিকটি ফুটে উঠেছে?

৪. 'ওরা যদি আমাদের মতন গরিব হয়ে যায় তবে খুব মজা হয়, কেমন না?'
'ওরা' কারা? কে বলেছে? ওদের গরীব হওয়ার সঙ্গে বক্তার মজা পাওয়ার সম্পর্ক কি?

৫. 'তোমাদের মেয়েমানুষের মধ্যেই থাক এটা বুঝলে না?'
কে, কোন্ প্রসঙ্গে বলেছেন? ব্যাপারটা মেয়েমানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চিন্তা বক্তা কেন করেছেন?

৬. 'তাকিয়ে তাকিয়ে আমি গাছটা দেখলাম।'
কোন গাছ? সেটি তারিয়ে তাকিয়ে দেখার কারণ কি? গাছটির ইতিহাস বর্ণনা করুন।

৭. আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপে চারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করেনিয়ে গেছে। কেবল মদনকে না আমাকেও...। কার মনে হচ্ছিল? এরুপ মনে হওয়ার পিছনে কোন্ রহস্যময়তা আছে বিশ্লেষণ করুন।

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯খ্রীঃ- ১৯৯৫খ্রীঃ)

সাহিত্য জীবন

আশাপূর্ণা দেবী এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না মহিলা সাহিত্যেক। গল্প উপন্যাস রম্যরচনা কবিতা স্মৃতি কথা মূলক রচনা সমাজ ধর্ম ,সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ এক কথায় সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বিচরণ করেছেন তিনি। তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভার তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে আহৃত হয়েছিল তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তিনি তাঁর চেনা জগতের বাইরে কখনো যাওয়ার চেষ্টা করেননি।

টিপ্পনী

পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তাঁর হয়নি। একপ্রকার অন্তপুরচারিণীর জাবনযাপন করতে হয়েছিল তাঁকে অনেকদিন। স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ না হলেও বিদুষী মাতা সরলাসুন্দরী অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যপ্রেম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। পারিবারিক আবহাওয়ায় সাহিত্যচর্চার একটা অনুকূল পরিবেশ থাকায় আশাপূর্ণ দেবী খুব ছোট বয়স থেকেই বিভিন্ন কবি লেখকদের রচনার সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। বাড়ীতে উল্লেখযোগ্য লেখকদের গ্রন্থসংগ্রহ থাকার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা গুলি দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। হিতবাদী সাধনা প্রবাসী সবুজপত্র ,বঙ্গদর্শন, নারায়ণ বসুমতী ভারতী , শিশুসাথী , সন্দেশ আরও অনেক পত্র পত্রিকায় পাঠিকা ছিলেন তিনি।

আশাপূর্ণা দেবী মোটামুটি ভাবে ১৯১২ খ্রীঃ এই সুদীর্ঘ কাল সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃতা ছিলেন। দুশোটিরও বেশী উপন্যাস এবং দেড়হাজারের বেশী ছোটগল্প রচনা করেছিলেন তিনি। জীবনে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন তিনি। ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক ক.বি, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাস শরৎ স্মৃতি পুরস্কার জগত্তারিণী পদক ক.বি পদ্মশ্রী দেশের অনেক গুলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী, বিশ্বভারতীর দেশি কোত্তম উপাধি এবং সর্বোপরি ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসেবে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটির জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ১৯৭৬ খ্রীঃ লাভ করেন।

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসগুলি সমাজ ও জীবনের বহুধাবিস্তৃত রুপাচিত্র নিয়ে লিখিত হয়েছে। পারিবারিক জীবন বিশেষ করে পরিবারের অন্দরমহলের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিচয় বাংলা উপন্যাসে আর কোন লেখক বা লেখিকার রচনায় পাওয়া দুষ্কর। মনুষ্যত্বের অবক্ষয়ের কাহিনী থেকে শুরুকরে আধুনিক আর্থ সামাজিক পটভূমিকায় যৌথপরিবারের ভাঙন , সমাজ ও পরিবারের যুগজীর্ণ নিয়ম ও প্রথার বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা নারীচরিত্রে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ, প্রেম ও প্রেমহীনতা ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। আশা পূর্ণা দেবীর উপন্যাসগুলিকে অনেকে নানা পর্বে বিভক্ত করে তার তালিকাও প্রস্তত করেছেন। সময়কাল ধরে বিচার করলে তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু ও ঔপন্যাসিকার ভাবনা চিন্তার একটা বিবর্তনধারাও পাঠকের চোখে পড়বে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ঔপন্যাসিকা জীবনের প্রায় বিত্রশ বছর সাধুগদ্যরীতিতে উপন্যাস রচনা করেছিলেন তবে চরিত্রের সংলাপ ছিল চলিত গদ্যরীতির।

বিভিন্ন সময়পর্বে লিখিত আশাপূর্ণা দেবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'প্রেম ও প্রয়োজন' ১৯৪৪ 'অগ্নিপরীক্ষা ' ১৯৫২'নির্জন পৃথিবী '১৯৫৫ 'শশীবাবুর সংসার'১৯৫৫

সমুদ্র নীল আকাশ নীল১৯৬১'সোনার হরিণ'১৯৬২ 'এক সমুদ্র অনেক ঢেউ'১৯৬৩ 'রাণী শহরের কানাগলি'১৯৬৪ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'১৯৬৪ 'সুবর্ণলতা'১৯৬৭'অন্তর বাহির'১৯৬৭অনিন্দতা ১৯৭১'হে ঈশ্বর তোমার যবনিকা'১৯৭৫ 'অবিনশ্বর ' ১৯৭৯ 'বকুলকথা' ১৯৭৪ 'অহল্যা উদ্ধার '১৯৮১'নিজস্ব রমণী' ১৯৮৫ 'সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক'১৯২২ ইত্যাদি।

টিপ্পনী

সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে বিচরণ করলেও আশাপূর্ণাদেবী ছোটগল্পের জগৎকেই বেশী পছন্দ করেতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, উপন্যাস আমাকে অনেক প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে তবু ছোটগল্পের ওপরেই আমার পক্ষপাত। কেন? হয়তো ছোটগল্পই আমার প্রথম প্রেম বলে। ছোটগল্পের প্রতি তাঁর পক্ষ পাতিত্বের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন আমার মনে হয় উপন্যাস লেখা যেন একটা 'কাজ' আর ছোটগল্প লেখাটা হচ্ছে 'আনন্দ' ।সেই আনন্দে অবগাহন করেই তিনি রচনা করেছেন প্রায় পনেরশ ছোটগল্প।

পারিবারিক, সামাজিক, রাজনীতি, কৌতুকময়তা, নারী জীবনের বিভিন্ন অবস্থা, মাতৃত্ব , নারীর স্ত্রী ভূমিকা নারীচরিত্রের বহুরুপতা বহুবিধ বিষয় নিয়ে বিচিত্র স্বাদের ছোটগল্পরচনায় আশাপূর্ণা দেবী সিদ্ধহস্ত। নারী জীবনের এত বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিচয় আশাপূর্ণা দেবীর মত খুব কম লেখকই প্রদান করেছেন। নারীস্বাধীনতা নারী অধিকার , নারীবিদ্রোহ ইত্যাদির কথা তাঁর গল্পে থাকলেও নারীর উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে তিনি যেমন সমর্থন করেননি। তেমনি নিজে নারী বলে নারী সমাজের প্রতি অকারণ পক্ষপাতিত্বও করেননি। পুরুষচরিত্রের প্রতিও লেখিকার সহানুভূতি ও সমর্থনের অভাব লক্ষিত হয় না। আশাপূর্ণা দেবী শিশু ও কিশোর বয়স্কদের জন্যও কম লেখেননি সেখানে লেখিকার মানসিকতা ও লিখনভঙ্গী হয়ে উঠেছে তাদের সঙ্গে মানানসই।

ছোটগল্পকার হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর সাফল্য সংশয়াতীত। তাঁর গল্পবলার রীতি সহজ সরল পান্ডিত্যের কাঠিন্য তাঁর গল্পগুলিকে যেমন নীরস করেনি, তেমনি তত্ত্ব ভারেও ভারাক্রান্ত করেনি। তিনি পাঠককে গল্প শুনিয়েছেন , তেমনি নিজেও অনেকসময় পাঠকের জিজ্ঞাসাকে নিজেরও জিজ্ঞাসা করে তুলেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল

'জল আর আগুন' ১৯৩৮?/১৯৪৪? 'রঙিন মলাট'১৯৪১'স্বপ্ন শর্বরী' ১৯৫৬ কনকদীপ ১৯৫৯ 'অবচেতন'১৯৬০ অতলান্তিক ১৯৬২ এক আকাশ অনেক তারা ১৯৭৮ ,'মানুষের মত মানুষ ১৯৮৬ নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ১৯৯৩ ইত্যাদি।'

ছিন্নমস্তা আশাপূর্ণা দেবী

ছিন্নমস্তা মাতৃত্বের অন্যরুপ

ছোটগল্পের ঘটনায় গতি নাটকীয়তা উৎকণ্ঠা ও সংক্ষিপ্ত পরিমিতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য গল্পের সূচনা হয় ঘটনার শীর্ষবিন্দু থেকে। এই বিষয়টিকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র একটু ভিন্ন ভাষার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ছোটগল্পের সূত্রপাত হয় ঘটনার মাঝখান থেকে। অর্থাৎ ছোটগল্পের ঘটনার যে প্রারম্ভ অংশে তা ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার রেশযুক্ত পরর্বতী ঘটনাংশ। আশাপূর্ণা দেবীর 'ছিন্নমস্তা'শীর্ষক ছোটগল্পটির সূচনাংশে পূর্বোক্ত শিল্পবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হবে। নতুন বর কনের স্টেশন থেকে বাড়ীতে আসার সময় ক্ষণের সংবাদ দিয়ে গল্পটির দ্বূচনা। বিবাহ

আয়োজন , বিবাহ অনুষ্ঠান , কন্যাবিদায় ইত্যাদি আনুষদিক ব্যাপার গল্প ঘটনায় অপ্রয়োজনীয় বলেই সেগুলি সযত্নে বর্জিত হয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনাই পাদপ্রদীপের আলোকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

'ছিন্নমস্তা' পারিবারিক জীবনের কাহিনী। নারীচরিত্রেরই প্রাধান্য সেখানে। লেখিকা নিজে মহিলা হলেও নারীচরিত্রের কেবল কল্যানীরুপের প্রতি তাঁর কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। মধ্যত্তি সমাজের রয়েছে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মধ্যবিত্ত মানুষেরা আত্মসচেতন, আদর্শবোধ মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে হয় একটু বেশী মুখর। পারিবারিক দায় বা দায়িত্ববোধ ইত্যাদি ব্যাপারে তারা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। নৈতিকতা বা দায়িত্ব বোধের সামান্য স্থলনকে তারা অমানবিকতা বলে মনে করে। আবার অতিমাত্রিক শ্রেণী সচেতনতা সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষদের থেকে তাদের কিছুটা বিছিন্ন করেও রাখে। পারিবারিক জীবনের নানা ঝড় ঝাপটা, স্বার্থ দ্বন্ধ, পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার পরিবর্তে খন্ডিত ব্যক্তিসত্তার অসংগত আতমপ্রকাশ পরিবারে আত্মঅধিকার প্রতিষ্টার প্রতিযোগিতা এগুলি নানান কারণে অধিকাংশ সময়ে বৃহত্তর সমস্যার সৃষ্টিকরে আর সমস্যার চতুর্দিকে ব্যক্তিমানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্মুখোশ হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

জয়াবতী স্বামীহারা। অকালবৈধব্য তাঁর । পুত্র বিমলেন্দুর বিবাহ নিয়ে তাঁর গোছানো পরিপাটি স্বপ্ন দীর্ঘদিনের । শহরে স্বাধীনচেতা বধুকে 'বাগ' মানাতে পারবেন না মনে করে পল্লীবাসিনী এক কন্যাকে বধূরুপে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। সুতরাং বধূর উপর কতৃত্ব চালানোর চিরন্তন অধিকারবোধ পূর্ব থেকেই শাশুড়ী জয়াবতীর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। গল্পের পাটভূমিকায় এমনি করেই ঢুকে পড়ে বাঙালী পরিবারের চিরন্তন শাশুড়ী পুত্রবধূর অধিকার বোধ প্রতিষ্ঠার দ্বন্ধ সংঘাত।

কিন্তু জয়াবতী লোকসমাজে তাঁর অন্তর্গূঢ় মানসিকতার দিকটি গোপন রাখেন। বধূবরণের যাবতীয় মঙ্গলাচার তিনি পালন করেন , ঘরবাড়ী তক্তকে ঝক্ঝকে করে তোলন নিজের পুরোনো'ভয়েল' শাড়ী কেটে জানালা দরজায় ঝুলিয়ে দেন আব্রুর পর্দা। এমনি করেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন সংসারে পুত্রবধূর গুরুত্ব তাঁর কাচে কতখানি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, পুত্রবধুর প্রতি তাঁর এই আগ্রিম মনোযোগ নতুন বধূকে তাঁর প্রতি অনুগতা করে তুলবে।

কিন্তু স্বপ্নের সৌধ বাস্তবের মাটিতে তাসের ঘরের মত ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। জয়াবতীও পুত্রবধূর য়ে স্বপ্ন ময় ধারণা মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন, সংসারে পুত্রবধূর আগমনের পর অতিস্বল্পসময়ে তা বিবর্ণ, ধূলিমলিন হয়ে গেল তার মনেও তখন সখেদ জিজ্ঞাসা " কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে রহিলে না ধ্যান ধারণার।" স্বপ্ন ও বাস্তবের গরমিল থেকেই শাশুড়ী জয়াবতী ও পুত্রবধূ প্রতিভার দ্বন্ধ ইতিহাস তীব্র আকার ধারণ করেছে।

পুত্রবধূর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের একটা অহংবোধ জয়াবতীর ছিল একথা সত্যি, কিন্তু এত সত্য যে বাঙালী পরিবারের বৌ কাঁটকী শাশুড়ীর মিথ্টাও তিনি একই সঙ্গে ভেঙে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু "বিমলেন্দুর বৌয়ের মতো বিয়ের কনে আসয়াই নিজ মূর্তি ধরার দৃষ্টান্ত আধুনিক মহলেও কম।" শাশুড়ীকে প্রতিদ্বন্ধিনী ধরে নিয়েই প্রতিভা সংসার অঙ্গনে প্রবেশ করেছিল শাশুড়ীর কার্যধারা বিচার করার কোন অবকাশই সে রাখেনি। ব্যঙ্গে বিদ্রপে, তুচ্ছ অনুযোগে অভিযোগে এবং স্বামীর সংসারে এক বিপরীত স্রোতের তীব্র আবর্ত রচনা করল। কিন্তু আপন আত্মজ বিমলেন্দুর স্ত্রীর প্রতিদুর্বলতা প্রতিবাদবিমুখতা জয়াবতীকে ব্যথিত করল

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তাঁর মনে হল বিমলেন্দুর জীবন ও সময়কে সম্পূর্ণ গ্রাস করেনিয়ছে নববধূ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে রাজলক্ষীরও ধারণা হয়েছিল পুত্রবধূ আশালতা মহেন্দ্রর সঙ্গে মায়ের অপার ব্যবধান রচনা করেছে সংসারের সে ইতিহাসও হয়ে উঠেছিল ধ্বংসদীর্ণ। জয়াবতী পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে একান্ত প্রেম সম্পর্ককে মায়ের প্রতি পুত্রের অমনোযোগিতা ও অবজ্ঞা বলে ধরে নিয়েছিলেন জয়াবতী পুত্র ও পুত্রবধূর দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এই ভাবে অনধিকার প্রবেশ করে সমস্যার মাত্রাকে করে তুললেন জটিলতর। আর বিমলেন্দু মা ও স্ত্রীরপ্রতিযোগিতার মাঝখানে পড়ে শুধুই মানসিকযন্ত্রণায় পিষ্ট হতে লাগল সে নাপারল মায়ের বিরোধিতা করতে নাপারল স্ত্রীর আচরণের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হতে। জয়াবতী সংসারের বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলেন বারবার তাঁর হার হতে লাগল পুত্রবধূর কাছে কিন্তু সেই পরাজয়ের গ্লানি তিনি পুত্রের সঙ্গে সমান ব্যথায় ভাগ করে নিতে পারলেননা। পুত্রের মৌনতা জয়াবতীর অন্তর্জ্বালাকে দ্বিগুণিত করে তুলল। সংসারে প্রতিভার অস্তিত্বই জয়াবতীর কাচে অসহ্য হয়ে উঠল।

প্রতিভার পিত্রালয়ে গমন ও পুত্রের কর্মস্থলে যাত্রা জয়াবতীকে সাময়িকভাবে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দিল। পুত্রবধূর পিত্রালয়ে গমন জয়াবতীর মানসিক স্বস্তির কারণ হতে পারে কিন্তু পুত্রের বিদায়ক্ষণেও জয়াবতীর আশ্চর্য উন্নাসিকতা চরিত্রটির একটি ব্যতিক্রমী আচরণ বলে গল্প লেখিকা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বস্তুত এখান থেকেই পুত্র বিমলেন্দুর সঙ্গে তাঁর মনোসিক দূরত্ব সূচিত হয়েছে। চাণক্য শ্লোকে বলা হয়েছে " খলত্ব করোতি দুর্বৃত্তং নূলং ফলতি সাধুষু" দুর্জন ব্যক্তিরা দুষ্কর্ম করে আর তার জন্য সজ্জন ব্যক্তিদের জীবনে নানা ঘাত প্রতিধাতের সৃষ্টি হয়। বিমলেন্দু তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পারদকে যেমন মুষ্ঠি বদ্ধ করা দুঃসাধ্য জয়াবতীর পক্ষে প্রতিভাকে আয়ও করা সেইরকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। দুদিনের অতিথি পুত্র এবং মাতর বন্ধনগ্রন্থিকে এত সহজে শিথিল করে দেবে এই হীন পরাজয় বরণ জয়াবতীর কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল। দুর্বাক্যে দুর্বিনীত ব্যবহারে। অবজ্ঞায় এবং সংসারে জয়াবতীকে এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব প্রতিপন্ন করাই যেন প্রতিভার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান জয়াবতী পুত্রবধূর এই ঔদ্ধত্যাকে প্রতিবেশীর ঘরে প্রচারের আলোকে নিয়ে এলেন প্রতিভাও গৃহাগত াতিথিদের সঙ্গে একান্ত আলাপে শাশুড়ী নিন্দায় হয়ে উঠল মুখরা অন্যদিকে বিমলেন্দু পুত্রবধূর প্রতিমায়ের আচরণের বাড়াবাড়িকে সমর্থন করতে পারেনি, মায়ের একদিনের তির্যক মন্তব্যে অতিবিরক্ত বিমনেন্দু অপ্রতিভ হওয়ার পরিবর্তে মায়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানিয়া স্বচ্ছন্দে বলিয়া গেল তোমার মনটনগুলো আজকাল কী সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য।

প্রাত্যহিক বিবাদ এবং শাশুড়ী পুত্রবধূর অধিকার প্রতিষ্ঠার অসম লড়াই একদিন চূড়ান্ত আকার ধারণ করল সজনের ডাঁটা খাওয়াকে কেন্দ্র করে জয়াবতীর ভাবাবেগকে নির্দয় আঘাত কবায়। লজ্জিতা অপমাতিা ও বিপর্যস্তা জয়াবতী সেদিন দর্পহারী মধুসূদনের কাছে দর্পিনীর দর্প নাশ করার আকুল প্রার্থনা জানালেন। কাকতালীয়ভাবে আকস্মিক দুর্ঘনায় এরপর বিমলেন্দুর মৃত্যু হল।

বিমলেন্দুর মৃতদেহের সামনে জয়াবতী দাঁড়িয়ে রইলেন নিস্পন্দভাবে। পুত্রশোকও জয়াবতীকে দুঃসহ বেদনায় শোকাপ্লুত করতে পারল না কিন্তু কেন সে জিজ্ঞাসা লেখিকারও। মানব মনস্তত্ত্বের গভীরে আছে সেউত্তর। সভ্যতার বহিরাবরণের আড়ালে আদিম প্রাগৈতিহাসিক আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক এক স্থূল মানসিকতা মনের গভীরে বিরাজ করে। কখনো কখনো তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানান ভঙ্গীতে নানান কার্য্যপ্রণালীতে।

জয়াবতী একমাত্র পুত্রের জননী। প্রতিভার জীবনে স্বামীই সর্বস্ব। বিমলেন্দুর মৃত্যু তাই উভয়ের জীবনকেই শূন্য করে দিয়েছে। কিন্তু জয়াবতী অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সকলকে অবাক করে দিয়ে পুত্রশোকের ধাক্কা সামলে উঠলেন। শুধুতাই নয় অতি স্বাভাবিক ছন্দে অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে দৈনন্দিন সাংসারিক কর্ম রান্নাবান্না গৃহসজ্জা সব কিছুতেই যোগ দিলেন। জয়াবতীর মনের গভীরে তখন জয়ের চোরা আনন্দ স্রোত বহমান। অকালবৈধব্য সংসারে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় পুত্রবধূ প্রতিভাকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। পুত্রশোককে অতিক্রম করে পুত্র বধূর পরাজয়ের এই ভবিতব্যই জয়াবতীকে এক নিষ্ঠুর আনন্দে মাতিয়ে তুলল। পুত্রশোক গৌণ, স্নেহমমতা মূল্যহীন সংসারে কর্ত্রীর অধিকার অটুট রখোই জীবনের মোক্ষস্বরুপ জয়াবতীর জীবনদর্শনের এই হৃদয়হীন সত্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে। জয়াবতীর তখন পুত্রবধূ প্রতিভার প্রতি সদয়া তার ভালোমন্দ আহার বিশ্রাম সবকিছুর প্রতি মনোযোগিনী কিন্তু সেই মনোযোগ ও স্নেহশীলতা হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হয় পরাজিতার প্রতি এক প্রকার অনুকম্পা।

টিপ্পনী

গল্পের নাম ছিন্নমস্তা। শক্তি সাধনায় বিশ্বমাতৃকা শক্তির দশটি রুপ কল্পিত হয়েছে সেই দশরুপের একত্রিত নাম দশমহাবিদ্যা। দশমহাবিদ্যারই একটি রুপ হল ছিন্নমস্তা, যেখানে মহামায়া মাতৃকা শক্তি আপন মুন্ড ছেদন করে তাঁর করতলে ধৃত ছিন্নমুন্ড দিয়ে তপ্ত রুধির পান করছেন। জয়াবতীকে লেখিকা সেই ছিন্নমস্তার সঙ্গে উপমিত করেছেন।

রচনার্ধমী প্রশ্ন

১. আশাপূর্ণা দেবীর 'ছিন্নমস্তা' ছোটগল্পের নামকরণটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করুন।

২. ছোটগল্প হিসেবে ছিন্নমস্তা কতখানি সার্তক আলোচনা করুন।

৩. বাঙালী পরিবারের শাশুরী পুত্রবধূর দ্বন্ধের পটভূমিকায় রচিত ছোটগল্প 'ছিন্নমস্তা' মধ্যে একটি বৃহত্তর মানবজীবন সত্য লুকিয়ে আছে পর্যালোচনা করুন।

৪. জয়াবতী চরিত্রের স্বরুপটি বিশ্লেষণ করুণ।

৫. জয়াবতীর কর্তৃত্ব ও অহংবোধ এবং প্রতিভার ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অদম্য ইচ্ছা 'ছিন্নমস্তা' গল্পে দুটি চরিত্রের মধ্যে একটি অশুভ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে, এই অভিমত কতখানি গ্রহণ যোগ্য বিচার করুন।

৬. 'ছিন্নমস্তা' গল্পে বিমলেন্দু চরিত্রটির কাহিনীগত উপযোগিতা বিচার করুন।

৭. বাঙালী পরিবারের অন্দরমহলের বাস্তবচিত্র হিসেবে 'ছিন্নমস্তা' ছোটগল্পটির মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. 'বৌ এসে কি কাঁচাপিটুলিতে পা দেবে?'
প্রসঙ্গটি কি? কাঁচাপিটুলি বলতে কি বোঝানো হয়েছে? বৌ আগমনের প্রস্তুতির অন্যান্য

দিক গুলি উল্লেখ করুন।

২. 'কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে রহিলে না ধ্যান ধারণার' পঙক্তিটি কার রচিত? গল্পাংশে পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত হওয়ার কারণ কী?

৩. 'বৌ আসছে বৈ তো রাণী আসছে না অতো বাড়া বাড়ি কিসের?' কোন প্রসঙ্গে কি জাতীয় বাড়া বাড়ির কথা এখানে বলা হয়েছে?

টিপ্পনী

৪. 'তারপর সেই ইস্টদেবীর মন্দিরে গিয়া ঢুকিল, আর পাওয়া যায় না ছেলের।'
'ইস্টদেবী' কথাটি কার সম্পর্কে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে কি জাতীয় মনোভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে?

৫. 'তোমার মনটনগুলো আজকাল কী সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য' বক্তা কে? কার প্রতি এই উক্তি? কোন্ প্রসঙ্গে বক্তাচরিত্রের এই অভিব্যক্তি?

৬. 'তেমন স্যাকরার হাতে পড়লে সোনাও লোহা হয়ে যায় দিদি।' প্রসঙ্গসহ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. 'প্রীতির সেই দুর্বলতাকে লোভ বলে নাই কেউ কোন দিন।' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উদ্দিষ্ট চরিত্রটির মানসিকতা বিশ্লেষণ করুন।

৮. 'প্রতিভার মতো একটা তুচ্ছ প্রাণীর দর্পচূর্ণ করিতে একেবারে গদাটারই প্রয়োজন হইল বীর পুরুষের।'
প্রতিভা কে? বীরপুরুষের গদার প্রয়োজন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

৯. "জয়াবতীর কণ্ঠ স্বরটাই শুধু কানে ঢোকে তাঁদের দৃষ্টি পড়েনা মুখচ্ছবির পানে?" কোন কণ্ঠস্বর? কণ্ঠস্বর ও 'মুখচ্ছবির' মধ্যে কি জাতীয় পার্থক্যের ইঙ্গিত লেখিকা দিয়েছেন?

চতুর্থ একক

শিক্ষার হেরফের

শিক্ষার হেরফের ঃ রবীন্দ্র-বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গী

টিপ্পনী

শিশুশিক্ষা থেকে সাবালক স্তর পর্যন্ত আমাদের দেশের যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে রয়েছে অসংখ্য অসঙ্গতি। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচত থেকে শুরু করেশিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় অধীত বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অসংযোগ এবং সীমিত ক্ষেত্রে নিছক জ্ঞান চর্চার সংকীর্ণতা ইত্যাদি নানান বিষয় এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ওশিক্ষাপ্রণালীকে ক্রমশ পঙ্গু করেতুলেছে। এই অসংগতিগুলির দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন মানসিক ও শিক্ষাগত বিকাসের অনুকূল স্তরপরম্পরাগত শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োগ। শিক্ষার্থীদের সামথ্য আছে প্রয়াস আছে, শুধু ব্যবস্থা পনার অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্তির পরিমাণ শুধু অপর্যাপ্ত নয়, কোন কোন ক্ষেত্রেস্বাধীন ব্যক্তি সত্তার বিকাসের পক্ষে অহিতকর। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে নানান উদাহরণ সহযোগে সেই বিষয় গুলি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের নামে যে পুস্তকগুলি নির্দিষ্ট হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে সেগুলিকে 'অপাঠ্যপুস্তক' আখ্যা দিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যদি সাহিত্যরস ও কল্পানাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার মত উপকরণ না থাকে তবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরেই শিশুর মনোবিকাশের স্বাধীন পথটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এদেশের পাঠ্য পুস্তক তালিকায় ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোল, নীতিপাঠ ইত্যাদির অন্তর্ভূক্তিকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি, কারণ ঐ বিষয়গুলি তাঁর মতে পাঠ্যপুস্তক নয়, শিক্ষাপুস্তকমাত্র। শিশুশিক্ষার জন্য প্রয়োজন সাহিত্যরসের অভিসিঞ্জন শুষ্ক জ্ঞানচর্চা শিশুর আগ্রহ ,পাঠের প্রতি নিষ্টা, সর্বোপরি মনের স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র টিকে সংকুচিত করে দেয়।

মানুষের জীবন কেবলমাত্র আবশ্যক জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের শরীরের অনুপাতে বাসগৃহের পরিসর বড় হওয়া প্রয়োজন কারণ তাতে শরীর, স্বাস্থ্য ও মানসিক আনন্দ অটুট থাকে। সেইরকম পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে বিদ্যাচর্চাকে আবদ্ধ না রেখে শিশুর মনের সার্বিক বিকাসের ব্যবস্থা রাখাটাও বাঞ্ছনীয় এজন্য প্রয়োজন 'স্বাধীন পাঠ'। স্বাধীন পাঠ শিশুর চিত্তবৃত্তির বিকাশ ঘটায় এবং মানসিক পরিণমনে সহায়তা করে। নিছক জ্ঞানার্জন শিশুর মানসিক পরিণমন ঘটায়না বলে বুদ্ধি বৃত্তির দিক থেকে সে নাবালকই থেকে যায়।

কিন্তু এদেশে পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত স্বাধীন পাঠের উপযুক্ত পুস্তকের সংখ্যাও নগণ্য। রামায়ণ মহাভারতের মত গ্রন্থ থাকলেও এদেশের বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা যেটুকু দেওয়া হয় তাতে ঐ সমস্ত গ্রন্থের সাহিত্যরস আস্বাদনের ক্ষমতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করে না। আবার তাদের ইংরেজী জ্ঞান ও তে স্বল্প যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত শিশু পাঠ্য গ্রন্থ পাঠে (২) তারা নিতান্ত অপারগ। কারণ ইংরেজী শিশু পাঠ্য গ্রন্থগুলিও এখন খাস ইংরেজীতে রচিত যে তার মর্যোদ্ধার বি.এ. এম. এ- দের পক্ষেও কষ্টকর।

এরকমই একটা ত্রিশঙ্কুঅবস্থায় পন্ডিত হয়ে বাঙালি ছেলেরা নিতান্ত বাধ্য হয়েই ব্যাকরণ

অভিধান ভূগোল চর্চাতেই নিজেদের জ্ঞান আহরণ সীমাবদ্ধ রাখে। ফলত অধীত শিক্ষা আত্মস্থ করে যেমন বলিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি গঠন করা তাদের পক্ষে সাধ্যাতীত ব্যাপার তেমনি আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক আড়ম্বর প্রকাশ করে অন্তরের দৈন্য ঢাকাটা একটা চলতি রেওয়াজ।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হিসেবে শিক্ষা কালে শিক্ষার্থীর আনন্দের অভাবের কতা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার্থীর পাঠ যদি কেবলমাত্র আবশ্যক গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে সেই বিশেষ গ্রন্থজ্ঞান কখনোই সম্পূর্ণতা লাভ করেনা জ্ঞানের সম্পূর্ণতাদানের জন্য প্রয়োজন আবশ্যক গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও কিছু গ্রন্থ পাঠ। তবেই মনের গ্রহণ শক্তি, ধারণ শক্তি এবং চিন্তাশক্তি সমঅনুপাতে বর্ধিত হবে।

টিপ্পনী

কিন্তু প্রচলিত নিরানন্দ শিক্ষা পদ্ধতির বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাটা যে সুগম একথা রবীন্দ্রনাথ মনে করেননি ।ইংরেজী শিক্ষা অধিগ্রহণও বাঙালি ছেলেদের কাছে সহজ পাচ্য ব্যাপার নয়। ইংরেজী বিজাতীয় ভাষা। বাংলা ভাষার বাক্যবিন্যাস পদগঠন ইত্যাদির সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। তাছাড়া বিদেশীর পরিবেশে লেখা ইংরেজী বাক্য বিন্যাসের সঙ্গে আমাদের দেশীয় পরিস্থিতি কিংবা বাক্‌রীতির মিলের পরিবর্তে অমিলটাই বেশী সেই হেতু ইংরেজী কোন বিষয় পাঠের সময় শিশুদেরকল্পনা বাস্মৃতি পাঠ্যবিষয়টির সঙ্গে কোন সম্পর্কেই স্থাপন করতে পারে না। ফল স্বরুপ মুকস্থ বিদ্যাটাই সেকানে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, যে মুখস্থ বিদ্যার সঙ্গে আনন্দ ময় জ্ঞানার্জনের প্রায় কোন সম্পর্ক ই নেই।

শিক্ষার সার্থকতা কেবল পাঠ্যপুস্তকের বিষয় বস্তুর উপরই নির্ভরশীল নয় শিক্ষকের নিজস্ব বিষয় জ্ঞান ,শিক্ষণ পদ্ধতি এসবেরও সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ।এদেশের শিক্ষালয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই যোগ্যতার অভাব লক্ষ্য করেছেন। যার ফলে শিশুরা নাশেখে ভালো, বাংলা না ইংরেজী। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দায় সারাজীবন বহন করতে হয় শিশুকে। ফলত এই শিক্ষা থেকে আনন্দরসের উৎসার ঘটেনা কিছুতেই। যেটুকু হয় তা হল পরীক্ষা পাশের পর কোন চাকরির সংস্থান।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেহ মন আত্মার সুষম বিকাশ ঘটানো। সুতরাং পাঠ্যবিষয়, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষকের শিক্ষণযোগ্যতা এসবের সঠিক উপস্থিতি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপ্রদান সম্ভব হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে এও মনে করেন শিশুর মানসিক চাহিদা মানসিক আনন্দ এবং শিখন আগ্রহ চরিতার্থ করতে গেলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কিন্তু এও লক্ষণীয়, শিক্ষক সমাজের ব্যর্থতার কারণে এদেশে বাংলা শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা দুটি ধারাই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে ।ফলত অসম্পূর্ণ শিক্ষার যাঁতাকলে পড়ে শিক্ষার্থীদের অবসর সময়যাপনের যেমন সুযোগ থাকে না, তেমনি সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশের পথ ও যোগ্যতার অভাবে রুদ্ধই থেকে যায়।

মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যলাভ ,অবসরের পিছুটানহীন আনন্দময় মুহূর্ত উপভোগ জীবনশক্তির উজ্জীবনের এই সুযোগ গুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সর্বস্ব পাঠ শিশুদের প্রাণহীন আনন্দহীন ও দুর্বল মস্তিষ্ক করে তুলছে। এর ফলস্বরুপ কোন সৃষ্টিশীল চিন্তা, সমস্যা সমাধানের বলিষ্ঠ মানসিকতা বা মৌলিক জীবনভাবনা অর্জনের উদ্যোগ কোনটাই শিশুদের মধ্যে লক্ষিত হচ্ছে না।

মানুষের জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রাবহের মত। শৈশব, কৈশোর ,যৌবন ,প্রৌঢ়ত্ব জীবনের

সর্বস্তরের মধ্যেই রয়েছে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। পূর্ব পূর্ব জীবনের শিক্ষা অভিজ্ঞতা জীবন বোধ ইত্যাদির সমন্বয়েই এক সময় পূর্ণ জীবনবোধ গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন চিন্তাশক্তি ও কল্পনা শক্তির উত্তরোত্তর দ্বমন্বয়সাধনের মধ্য দিয়েই জীবনের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন আমরা কেবল প্রয়োজনের শিক্ষাটুকুই গ্রহণ করি এবং কোন ডিগ্রীলাভকে মোক্ষলাভ বলে মনে করি তখন সিক্ষার মধ্যে এক নিবিড় অনধ্যানের পরিবর্তে শৈথিল্য অনুপ্রবেশ করে। তখন জীবনের বিভিন্ন স্তরে লব্ধ শিক্ষার সঙ্গে বর্তমান শিক্ষার কোন যোগসূত্র থাকে না। শিক্ষা তখন আহরণের সামগ্রী হয়ে ওঠে প্রাণের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে না। স্তূপীকৃত জ্ঞান তখন বিশালতা অর্জন করে সত্যি কিন্তু জীবন নির্মাণ কাজের য়োগ্য সহায়ক হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতে " জীবনের সঙ্গে জীবনের আশ্রয় স্থলটি গড়িয়া তোলই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ একদিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর একদিকে জমা হইতেছে, খাদ্য একদিকে ভান্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে পাকযন্ত্র আর এক দিকে আপনার জারকরসে অল্পনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব কান্ড চলিতেছে। ''

টিপ্পনী

কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যা যে প্রকৃত শিক্ষা নয় শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদ চিরকালের। মুখস্থ বিদ্যা বোধহীন ,অর্থহীন যান্ত্রিক এবং প্রয়োগবিমুখ। অধীত বিদ্যাকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগমুখী করে তোলার জন্য প্রয়োজন চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি। শিক্ষা যদি শিশুকে স্বাধীন চিন্তার অবকাশ না দেয় তবে শিশুর শৈশবত্ব কিছু তেই যোচেনা। ভূমিকর্ষন ভূমিপরিচর্যা বাবীজবপন সোনার ফসল ফলাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত রস বৃষ্টি ধারা। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টির যোগান না পেলে ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে য়েমন সুফল মেলে না তেমনি বয়োবিকাশের বিভিন্ন স্তরে নিয়মিত ভাবে শিশুর মধ্যে যদি জীবন্ত ভাব নবীন কল্পনা ও চিন্তা শক্তির উদ্রেক না হয় তবে শিশুর শিক্ষাযেমন অসম্পূর্ণ থাকে তেমনি জীবন বিকাশ হয় স্তব্ধ। শিশুর যখন প্রথম জ্ঞানোন্মেষ ঘটে সমাজ সংসার ও প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রতি বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি আবিষ্ট হয় যখন তার চিত্তলোকে জাগ্রত হয় কৌতূহল ও নব নব জিজ্ঞাসা তখন যদি উপযুক্ত উপকরণে তার সেই নবীন মন চর্চিত না হয় তবে মনেবিকাশের সম্ভাবনা মূলেই বিনষ্ট হয়। তখন ইউরোপীয় শিক্ষার "মুষলধারাতেত্ত'' সেই মনে প্রাণের সাড়া জাগে না রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবন শক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজ ভাবে প্রবেশ করিতে পারেনা।''

উপযুক্ত কর্ষণ ব্যতীত ভূমি যেমন বন্ধ্যা থেকে যায় তেমনি উপযুক্ত বিষয় সৃষ্টি শীল কল্পনা ও উদ্ভাবনী চিন্তা শক্তির সাহচর্য ব্যতীত শিশুর শিক্ষা মূল্যহীনহয়ে পড়ে। বিস্তর শ্রমে এবং উদ্দেশ্যহীন প্রয়াসে শিশু যখন মুখস্থ নির্ভর বিদেশী শিক্ষা আয়ত্ত করে তখন অন্তরের দীতাকে সে বিলতি ডিগ্রীর চাকচিক্য দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করে। বাগাড়ম্বর ও অসংগত প্রচারধর্মিতা সেই শিক্ষাকে নামিয়ে আনে প্রায় প্রহসনের স্তরে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বাল্যকাল থেকেই যদি ভাষা সিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হয়ে থাকে তবেই আমাদের জীবনের মধ্যে একটা যথার্য সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। সেজন্য প্রয়োজন আমাদের জীবন নির্বাহপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের শিক্ষার যথার্থ আনুপাতিক সম্পর্ক স্থাপন। যে শিক্ষা আমাদের সামাজিক আদর্শ পারিবারিক আদর্শ পরিচিত পৃথিবী ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির রুপবৈশিষ্ট্যকে এক নিবিড় ঐকতালে অনুরগিত করে তোলে না সেই শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের একাট বড় ব্যবধান সূচিত হয়। ঐ সংকীর্ণ

শিক্ষা নিতান্ত অর্থকরী শিক্ষা, তার দ্বারা জীবন জীবিকার একটা সুরাহা হয়েতো হতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের আটপৌরে দৈনিক জীবনের মর্মস্পর্শী সম্পর্ক তৈরী হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্যপ্রান্তে মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ অভিধানের সেতু। শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সংলগ্ন নয় বলেই বিদেশী শিক্ষা ও ভাবে লালিত এদেশীয় শিক্ষিত জন কখনো কুসংস্কারে মগ্ন আবার কখনো জীবনের উচ্চভাব থেকে বঞ্চিত হয়ে ধনোপার্জন অথবা ইহলৌকিক উন্নতিতে সদাব্যস্ত।

টিপ্পনী

জীবনের সর্বস্তরে যদি একথা প্রচারিত হয়যে ইংরেজী শিক্ষা মিথ্যা ও দেশীয় ভাবসকলই সত্য তাহলে ইংরেজী শিক্ষিত জনের মনেও ইংরেজীর প্রতি শ্রদ্ধাসন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয় না। আসলে আমরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিনা যে শিক্ষা প্রণালীর ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণেই শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ ভয়ংকর আকার ধারণ করছে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন শিক্ষার সঙ্গে জীবনের মিলন সাধনের প্রদান মাধ্যম হল বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য। উদাহরণ স্বরুপ তিনি এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পদিত বঙ্গদর্শন ১৮৭২ পত্রিকার কথা উল্লেখকরেছেন। তাঁর মতে বঙ্গদর্শন। বঙ্গদেশের সমস্ত শিক্ষিত মানুষের অন্তর্জগৎকে এক অভূতপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত করে তুলেছিন। বঙ্গদর্শন ইংরেজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তকরণের মধ্যবর্তী যে ব্যবধান তা ভেঙে দিয়েছিল। এই ব্যবধান দূর করা সম্ভব হয়েছিল কারণ বঙ্গদর্শন বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটনা করেছিল। এই আনন্দ ভাবই এদেশের শিক্ষিত মানুষ গুলিকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মাতোয়ারা করেছিল সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল আমাদের পরিচিত সমাজ পরিচিত মানুষদেরজীবনালেখ্য।

বঙ্গদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই শিক্ষিত বাঙালী তার নিজস্ব মনোভাবকে বাংলা ভাষায় প্রকাশের জন্য উদ্গ্রীব হয়েছিল। এর কারণ মনের ভাব প্রকাশে যে স্বাচ্ছন্দ্য বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় ইংরেজীতে তা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যা হল ইংরেজী শিক্ষা ভিমানী গণ বিনা অনুশীলনে কিংবা বাংলা ভাষার অন্তনিহিত গভীর ভাব ও সৌন্দর্য অনুধাবন না করে যদি বাংলা সাহিত্যে ব্যৎপত্তি অর্জন করতে চান তবে তা নিষ্ফল হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার অন্তসারপূন্য গরিয়ার কাছে অতুল ঐশ্বর্যমালিনী বাংলা ভাষা কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না। স্বতোদ্যোগী হয়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটানোর ব্যর্ততাই এদেশে শিক্ষিত জনের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি এক প্রকার অবজ্ঞার ভাব সৃষ্টি করে চলেছে।

এই ব্যবধান তখনই দূরীভূত হবে যখন ভাবের সঙ্গে ভাষার এবং শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যে দূরত্ব আছে তার হেরফের ঘটবে অর্থাৎ অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার যে অসঙ্গতিসমূহ উল্লেখ করেছেন সে বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

২. ‘আমাদের পানীও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না’ – ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটির যথার্থ্য বিচার করুন।

৩. ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার যে প্রতিফলন ঘটেছে তার গুরুত্ব নিরূপণ করুন।

৪. ‘সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই কাজটা পাকা রকমের হয়।’ – উদ্ধৃতিটি অবলম্বনে আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর যে অসম্পূর্ণতা, তা দূরীকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত উপায়গুলির যৌক্তিকতা নির্ণয় করুন।

৫. ‘বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই।’
শিক্ষায় আনন্দ না থাকার কারণ কি? নিরানন্দ শিক্ষার ফলশ্রুতি কি? এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন্ বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন?

টিপ্পনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. ‘মা সরস্বতী যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সদ্‌গতি হয় না।’
কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে? মন্তব্যটির মধ্যে কোন্ বাস্তব সত্য লুকিয়ে আছে?

২. ‘অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না।’ উদ্ধৃতাংশটি অবলম্বনে অত্যাবশ্যক শিক্ষা ও স্বাধীন পাঠের মিশ্রণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন উপস্থাপিত করুন।

৩. ‘আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়।’
‘নীরস শিক্ষা’ কাকে বলা হয়েছে? কোন্ ‘মাহেন্দ্রক্ষণ’ অতীত হয়ে যায়? এ প্রতিবিধান কি?

৪. ‘ইংরেজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে।’
রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের পিছনে কোন্ যুক্তি আছে বলুন।

৫. “আমি আর কিছু চাহিনা, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও।”
প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক মূল প্রবন্ধে লেখক শিক্ষা সম্পর্কে যে ‘হেরফের’-এর কথা বলেছেন তা উল্লেখ করুন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাস ঃ রবীন্দ্রনাথের অভিনব ইতিহাস বোধ

ইতিহাসের একচি বহিঃরঙ্গ সংজ্ঞা আছে। অতীত ঘটনার বিশ্বস্ত সংকলন হল ইতিহাস। কিন্তু অতীতে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই ইতিহাসে সংকলিত হয় না। যে সমস্ত ঘটনা রাজ্যের উত্থান পতন রাজা রাজড়া শাসকের জয় অথবা পরাজয়ের ঘটনা ঘনঘটায় আকীর্ণ রাজনৈতিক উপপ্লবে অশান্ত কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমৃদ্ধ অথবা অবক্ষয়িত এক কথায় যে সমস্ত ঘটনায় সঙ্গে এক বাএকাধিক জাতির অস্তিত্ব অনস্তিত্ব জীবন প্রবাহ শিল্প সংস্ক-তি ইত্যাদি সমূহ বিষয় তড়িত ইতিহাস গন্থে সেগুলিই গৌরবের সঙ্গে জায়গা করে নেয়। কিন্তু এর লেপথ্যেও অনেক বিষয় ও ঘটনা থাকে যা সচরাচর ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয়না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা

করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বহিরঙ্গ ইতিহাসের যে পরিচয় পেয়েছেন তাকে অসম্পূর্ণ অযথার্থ ও বিকৃত ইতিহাস বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

টিপ্পনী

সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের যে ইতিহাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত তা হল বারবার বহু বিদেশী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার রক্তাক্ত ইতিহাস। দেশী এবং বিশেষত বিদেশী ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী বহিশক্তি এবং বিজিত ভারতবাসীর প্রসঙ্গটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউই ভারতবর্ষের মর্মস্থলের সংবাদ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেননি কিংবা ভারতবর্ষ নামক দেশ ওসমাজের চিরন্তন আন্তরধর্মটিকে প্রকটিত করেননি। বস্তুত ভারতবর্ষের সেই অন্দরমহলে প্রবেশ করার সামর্থ্য অথবা ইচ্ছা কোনটাই বিদেশী ঐতিহাসিকদের ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাস যে বারংবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস নয় রাজ্যের ভাঙা গড়া উত্থান পতন বিজয়ীর উল্লাস ও বিজিতের আর্তনাদের অন্তরালেও এর যে একটি চিরন্তন শান্ত সমাহিত সর্বজনীন ঐর্কের বাতাবরণ ছিল বহু ঘটনার মধ্যে সেগুলিও স্বীকার করে নিতে হবে। করীর নানক শ্রীচৈতন্য তুকারম প্রমুখ যুগপ্রবর্তকেরা ভারতবর্ষের সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রতিকূল পরিবেশেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইতিহাসের রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে তখন দিল্লী আগ্রার রাজপথ হয়তো মুখরিত ছিল কিন্তু কাশী বৃন্দাবন নবদ্বীপের বুকে সেই প্রতিকূলতার দিনেওভারত ঐতিহ্যের মনোযোগী অধ্যয়ন বজায় ছিল। সুতরাং প্রকৃত ভারতবর্ষের আদর্শ ইতিহাস রচিত হতে পারে ভারতবর্ষের অন্তনিহিত জীবনীশক্তির পরিচয় প্রদানে। সেখানে ক্ষমতালাভ রক্তারক্তি শাসকের দম্ভ ভারতীয় জাতর কলঙ্কিত পারাভব কোনটাই মুখ্য ব্যাপার নয় কারণ ভারতবর্ষ বিদেশী শক্তি দ্বারা অধিকৃত হলেও সে কখনোই তার নিজস্বতা বিসর্জন দেয়নি বরং দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে চিত্তের এই উদারতায় শতবিরোধের মধ্যেও ঐক্যের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস এই সূক্ষ্ম জীবনভাবনায় নিহিত।

পৃথিবীতে যে যে জাতির নিজস্ব ইতিহাস আছে সেই সেই জাতি ভাগ্যবান। কেননা জাতির ইতিহাসের গৌরব তারা সরাসরি অনুভব করতে পারে এবং সেই সঙ্গে গৌরবান্ডিত ঐতিহ্যটি বহমান রাখার ব্যাপারে উৎসাহিতৎ হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষের যে লিখিত ইতিহাস তা স্বদেশকেই এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে তা জাতির সামনে দেশের স্বরুপটিকে কোনমতেই উদ্‌ঘাটিত করেনা। ঐতিহাসিকের দৃষ্টির আলোযদি রাজা বাদশা বিনাস বৈভব নর্তকীর লাস্য সুলতান প্রেয়সীদের রুপলাবণ্য রাজকর্ণচারী সুদৃশ্য অন্তপুর ইত্যাদির উপরই পতিত হয় তবে রহস্যের ইন্দ্রজালে ইতিহাসের সত্য আবৃত হয়। মুঘলযুগের অবসানের সঙ্গে এদেশে বিদেশী বনিকজাতিদের আগমন ইংরেজের রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা সর্বত্রই বহিরাগত শক্তিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতবর্ষ সেখানে যৎ কিঞ্চিৎ উপস্থিত।

প্রকৃত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেঐতিহাসিকের নিষ্ঠা প্রজ্ঞা সত্য আবিষ্কারের উৎসাহ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকগণ অতীতের কাগজ পত্র দলিল দস্তাবেজ বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদির উপরই অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কারণ ইতিহাস বলতে তাঁরা স্থূল প্রামাণিক উপাদন গুলিকেই মান্য করেন। ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাসে পলিটিক্‌সের আড়ম্বর নেই যুদ্ধজয় বা পরদেশ আক্রমনের নথি নেই তাই ঐতিহাসিকেরা ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় উৎসাহ বোধ করেননি। কিন্তু পৃথিবীর এখাবৎ যে পরিচয় সেখানে এমন অনেক বিষয় আছে যার মর্মোদ্ধারের জন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ তথ্য গৌণ ব্যাপর সেখানে প্রয়োজন ঐতিহাসিকের

অন্তদৃষ্ঠি এবং কোন বিষয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্বনির্ণয় করার দুর্লভ প্রজ্ঞা। এসবের অভাবেই ভারত বর্ষ সম্পর্কে রচিত ইতিহাস আমাদেরমনে না দেশ না ভারতীয় জাতি কোনটার সম্বন্ধেই গর্ববোধ সৃষ্টি করতে পারেনি। আমরা শুধু জেনোছি আমাদের পূর্ব পুরুষদের কোন যুদ্ধ জয়ের খ্যাতি নেই ব্যবসা বানিজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব নেই সুতরাং আমরা নিতান্ত দীন জাতি।

দেশেরইতিহাস জাতির মনে আত্মগৌরব ও আত্মমর্যাদাবোধের সূচনা করে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটা সৃষ্টি শীল যোগসূত্র গড়ে তোলে তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর আমাদের প্রেমের ভিতর আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে।

টিপ্পনী

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস স্থূল ঘটনামালার দুরন্ত আবর্তে নিমজ্জিত যে ইতিহাস থেকে গিয়েছে অলিখিত সেই ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে ভারত বর্ষের মৌল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল বিভেদের মাঝে ঐক্যস্থাপন বহুমতের সমন্বয়সাধন এবং বাইরের অনৈক্যকে জয় করে নির্বিরোধে ভিতরের নিগূঢ় সত্তার সঙ্গে যোগমূত্র রচনা করা। ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রনৈতিক নয় সামাজিক এবং অনিবার্যভাবে মানবিক। রাষ্ট্রগৌরব প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে থাকে অহংবোধ আগ্রামন এবং পরের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃপ্ত বাসনা পাশ্চাত্যে এটাই হল পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি। এই পোলিটিক্যাল উন্নতি বিরোধ মূলক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন বিরোধের দ্বারা বিরোধের অবসান হয় না।

উপরন্ত তা নতুন বিরোধের জন্ম দেয়। ভারতবর্ষের অভিমুখ এব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করেছে তা মিলনমূলক।ইউরোপীয় সমাজে আত্মশক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা এত প্রবল যে সেখানে বিচ্ছেদ ও বিরোধ সদাজাগ্রত। ফলে অসাঞ্জস্যই সেখানে বড় হয়ে দেখা যায়। এই অসামঞ্জস্যের উপদ্রবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারী আইন প্রণয়নও সেখানে জরুরী হয়ে পড়ে অর্থাৎ বিরোধ প্রতিবিরোধ এক নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাধারায় সেখানে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এটা অবশ্য ম্ভাবী রবীন্দ্রনাথ এর কারণ স্বরুপ বলেছেন বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই তাহার শস্য।

ভারতবর্ষ ঐক্যসন্ধানী।বিসদৃশকেও সে ঐক্যবন্ধনে বেঁধেছে।যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্যস্থানে বিন্যস্ত করে সংযত করে তার মধ্যে ঐক্যস্থাপন করার দুর্লভ কৃতিত্ব ভারতবর্ষ চিরকাল প্রদর্শন করেছে পাশ্চাত্যের মত বলপূর্বক ঐক্যসাধনের প্রয়াস সে করেনি।কারণ ভারতবর্ষ জানে পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় সেই বিচ্ছেদের সময় প্রণয় ঘটে। এর উদাহরণ স্বরুপ রবীন্দ্রনাথ ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইউরোপের অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে নিজের স্বাতন্ত্র্য যেমন বজায় রেখেছে তেমনি তার ভিতরকার ঐক্যমূলক শক্তির দ্বারা দেশী বিদেশী আর্য অনার্য সমস্ত জাতিকেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। বাইরের পুজ্জীভূত শক্তর চাপে ভারত বর্ষযে নতজানু হয়নি তার প্রধান কারণ তার আত্মধর্ম ও আত্মচরিত্রের শৃঙ্খলাপরায়ণতা এই নিয়মপৃঙ্খলাই বহিরাগত শক্তি কিংবা জাতিকে সমস্থান নিয়ন্ত্রণ করেছে কিন্তু উপেক্ষা করেনি। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় নীতি শৃঙ্খলার আদর্শ অনুসরণ করেনি বরং বলপ্রয়োগের নীতি প্রবর্তন করেছে। এস্থলে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন।

কেবল সমাজ ব্যবস্থার ইতিহাসে নয় ভারতের আধ্যাত্মিক বা ধর্মনীতিতেও এই ঐক্য ও শৃঙ্খলাস্থাপনের নীতি পরিলক্ষিত হবে। ইউরোপের রিলিজিয়ন আর ভারতের ধর্ম সমার্থবাচক শব্দ নয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। ভারতবর্ষে ধর্মকে সমগ্র জীবনের অঙ্গরুপে স্থান দেওয়া হয়েছে আমাদের সামাজিক ধর্ম পারিবারিক ধর্ম ইহকাল ও পরকাল কোনটাই পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয় সব মিলিয়েই ভারতবর্ষের ধর্ম ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোক ব্যাপী মানবের সমস্ত জীবন ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতি রুপে দেখিয়াছে।

টিপ্পনী

ভারতবর্ষের সাধনা বহুকে এক করা এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মারমধ্যে অনুভব করা এবং সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস ঐ আদর্শ পরস্পরার মধ্যেই নিহিত আছে ঐ ভাবসমূহ যেদিন অনুভূত হবে সেদিন অনুভূত হবে সেদিন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ লুপ্ত হইবে।

প্রবন্ধের পরবর্তী স্তরে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রকৃত ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার জন্য একজন নিরপেক্ষ সত্যসন্ধানী ও ভারতসচেতন ঐতিহাসিকের সন্দান করেছেন যিনি শ্রদ্ধার দ্বারা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করবেন আমাদের ঔদাসীন্য ও আত্মঅবিশ্বাসকে তিরস্কার করবেন এবং আমাদের লুপ্ত প্রাচীন সম্পদ পুরুদ্ধার করে বিশ্বের কাছে আমাদের দীনতা দূর করবেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্বকে দান করবার শক্তি যোগাবেন। ভারতইতিহাসের মর্মকথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলবেন যে পলিটিক্স্ বা বাণিজ্য আমাদেরমোক্ষ নয় বৈরাগ্যস্রাত নিরহংকার অর্থলোভশূন্য মাহাত্ম্যের পথ আমাদের শিরোধার্য। শুধু গ্রহণের দৈন্য নয় দানের গৌরবেই আমরা চাই গৌরবান্বিত হতে। ভাবীকালের ঐতিহাসিক সেই দানভান্ডারের উৎস কোথায় তা যেন দেখিয়ে দেন।

ইংরেজ যা দান করে অশ্রদ্ধার সঙ্গে দান করে দানের গৌরবে তারা গৌরবান্বিত হতে চায় আর দানের পাত্রের প্রতি তাদের অবজ্ঞা বর্ষিত হয়। এই অবজ্ঞা ইংরেজের শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদিন কার প্রাপ্য বিষয়। কিন্তু ইংরেজের দেশে সমগ্র শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে রয়েছে অনুকূল পরিবেশ ফলত সেখানকার শিশুগণ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। বিপরীত দিকে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বত্র প্রতিকূলতা বিদ্যমান। এদেশীয় শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন বিদেশী অধিকার থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করে শিশুকে স্বদেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং স্বদেশীয় ভাব ভাবনা ও হৃদয় মনের সঙ্গে শিক্ষার যোগমূলস্থাপন ।

কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষা ক্ষেত্রে আদর্শ শিক্ষক বা গুরুর আজ একান্ত অভাব। শিক্ষা আজ পর্ণ সামগ্রী। অর্থের অঙ্কে শিক্ষাদানের মান নির্ণীত হয় এখন। রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী। তিনি মনে করেন এমন একদিন আসবে যে দিন শিক্ষককুল বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

শকুন্তলা

শকুন্তলা ঃ কালিদাসের সৃষ্টির নতুন রবীন্দ্র-ভাষ্য

কালিদাস ও শেক্স্পীয়র হলেন যথাক্রমে প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের দুজন মহাকবিও নাট্যকার।

একজনের সময়কাল প্রাচীন তার পরিমন্ডলে প্রাচীন ভারতীয়সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ তিনি কালিদাস। অপরজন ইউরোপ ভূখন্ডের অন্তর্গত ইংল্যান্ড নামক সমৃদ্ধ শালী একটি দেশের প্রতিষ্ঠিত সারস্বসাধক তাঁর আবির্ভাবকাল অপেক্ষা কৃত অর্বাচী। তিনি হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্স্পীয়র। যুগ সমাজ এবং চিত্তবৃত্তির পার্থক্যের কারণে উভয়ের শিল্পী সত্তার পার্থক্য বা বৈপরীত্য থাকাটা একান্ত স্বাভাবিক। তথাপি যুগ ও সমাজের পার্থক্য সত্ত্বেও মানব মনীষার স্বভাবধর্মে একটা যোগসূত্র প্রায়শাঃই লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রাচ্যের বাল্মীকি আর পাশ্চাত্যের হোমারের মহাকাব্যিক ভাবনার একটা সূক্ষ্ম মেলবন্ধন রসজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়না।

টিপ্পনী

শেক্স্পীয়র ও কালিদাস উভয়ের নাট্য আঙ্গিক বিষয়বস্তু এবং চরিত্র বিন্যাস পদ্ধতিতে পৃথক পৃথক রীতি গৃহীত হয়েছে। তথাপি অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্ ও টেম্পেস্ট এর সঙ্গে সাদৃশ্য সূত্রকে বেশ কিছুটা পর্যন্ত অগ্রসর করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।বলা বাহুল্য উভয় নাটকের সঙ্গে এই সাদৃশ্য অনেকটাই বহিরঙ্গ। নাটক দুটির সাদৃশ্য মূলত দুটি দিক থেকে –

১. সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্য অধ্যুষিত নির্জন দ্বীপ বড় হয়ে ওঠা মিরান্দার সঙ্গে নির্জন তপোবনে প্রতিপালিতা শুকন্তলা চরিত্রের বহিসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট।

২. শকুন্তলা ও মিরান্দা উভয়েই বহিরাগত দুটি পুরুষ চরিত্রের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিল। বহিঃসাদৃশ্যের এই প্রকর গুলিকে বাদ দিলে নাটক দুটির মধ্যে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

শকুন্তলা তপোবনের সঙ্গে একান্ত। তপোবনের প্রাণধর্ম প্রকৃতির নির্মলতা স্নিগ্ধতা এবং পবিত্রতা সব কিছুর প্রতিফলন শকুন্তলা চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। এই নাটকে প্রকৃতি প্রাণবান চরিত্র। প্রকৃতিকে তার স্বভাবধর্মে অটুট রখে কালিদাশ প্রকৃতিকে এখানে শকুন্তলার সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। ফলে শকুন্তলা যেমন একদিকে প্রকৃতির মত স্নিগ্ধ অন্যদিকে তেমনি সাধারণ নারী চরিত্রের মত মানষী সত্তার অধিকারিণী। প্রকৃতি বা নিসর্গ কাব্য বা নাটকের অন্যতম প্রধান বিষয় বস্তু হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির রুপচিত্রণে বিভিন্ন কবি বা রচয়িতা পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রকৃতিবোধ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সেই হিসেবে প্রকৃতি কখনো কাব্য বা নাটকের পটভূমিকা আবার কখনো বা মূল ভাবের প্রকাশ সহায়ক উপকরণ। অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতি কাব্য বা নাটকের পাশ্বচরিত্র এমনকি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রধান চরিত্র রুপেও আত্মপ্রকাশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতিকে অনেক সময় রুপকার্থে জীবন্ত চরিত্রের মর্যাদা দিতে গিয়ে প্রকৃতিকে বিশেষ তত্ত্বের বাহকও করেতোলা হয়েছে। স্বভাবতই প্রকৃতি সেখানে কৃত্রিম ও আরোপিত প্রাণবিশেষ।

কিন্তু কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাসের কাব্যে নাটকে প্রকৃতি এক নতুন তাৎপর্যে মন্ডিত হয়ে উঠেছে। কালিদাসও অনেক সময় প্রকৃতিতে কাব্য পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন কখনো মানব ভাবও আচারণের সমান্তরালে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্য রঘুবংশস্ কিংবা মেঘদূতম্ এ প্রকৃতিকে পূর্ব উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রযুক্ত হতে যায়। মেঘদূতের প্রকৃতি মূল কাব্যভাব স্ফুরণের প্রধান সহায়ক কিন্তু প্রকৃতির রুপচিত্রণে কালিদাসের কবিত্ব ও প্রকৃতিবোধ তাঁর অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্ নাটকে প্রতিভার সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছে। অভিজ্ঞানম্ শখুন্তলম্ এ প্রকৃতি কোন পার্শ্বচরিত্র নয় প্রধান তম চরিত্র। আশ্রম ও তপোবনের মানবচরিত্র অপেক্ষা প্রকৃতি এখানে অনেক বেশী স্পর্শকাতর কোমলপ্রাণ সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক। অথচ

প্রকৃতির উপর এই মানবিক গুণ আরোপ করতে গিয়ে কালিদাসের হাতে প্রকৃতি কোথাও কৃত্রিম প্রাণহীন বা যান্ত্রিণ হয়ে পড়েনি। এই নাটকে প্রকৃতি নিজেকে অবিকৃত রেখে কালিদাসের অনির্বচনীয় কাব্য নির্মাণ কুশলতার মানবচরিত্রের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে।

আশ্রম পালিতা মাতৃপরিত্যক্তা অপ্সরা কন্যা উদ্ভিন্ন যৌবনা শকুন্তলা এই জীবন্ত প্রকৃতির বুকেই প্রকৃতির কন্যার মত অপাপবিদ্ধা হয়ে বর্ধিত হয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকেই সে সংগ্রহ করেছে সমস্ত কোমল গুণ এবং অমলিন প্রাণধর্ম। প্রকৃতির লতা পাতার সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে তার আত্মার আত্মীয়তা হরিণ শিশুদের সঙ্গে ভ্রাতা ভগ্নীর সম্পর্ক। বস্তুত পক্ষে শকুন্তলাকে কালিদাস মানবসমাজ থেকে বহু দূরবর্তী রেখেও প্রকৃতির সমাজে তার যে পুনবাসন ঘটিয়েছেন সেই চিরন্তন প্রকৃতি শকুন্তলার সঙ্গে কিরুপ নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে সেটি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

টিপ্পনী

শকুন্তলার সঙ্গে প্রকৃতির অভিন্ন হৃদয়সত্তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত। রবীন্দ্রনাথ বলেন শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাই নহে স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়। কেননা কালিদাস তাঁর নাটকে য়ে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন তা কেবল মাত্র কাব্যের অঙ্গ সৌষ্ঠই বৃদ্ধি বা অকারণ কবিত্ব প্রকাশের জন্য নয় প্রকৃতিকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মোচিত করে তোলার জন্য। শকুন্তলার পরিমন্ডলে ঋষি কন্ব ছিলেন সংযমনিষ্ঠ গৌতমী ছিলেন ছিল শুষ্কহৃদয় মষিকুমারগণ কিন্তু শকুন্তলার সুকুমার হৃদয়ে অবিকচ কুসুমগুলি প্রেমের সূর্যালোকে বিকশিত করে তোলার জন্য কেউই তারা সূর্যতপা শকুন্তলার সহায়ক নয় বরং অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সেদিক থেকে উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে রমণীর নবজাগ্রত রমণীয়ত্ব সম্পর্কে প্রতিমুহূর্তে সচেতন করে তুলেছে আর প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার অবসরের নিভৃত কথোপকথনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে ষোড়শী শকুন্তলার লজ্জা ব্রীড়া ও প্রণয় সম্পর্কে অস্পষ্ট অব্যক্ত ধারণা। কিন্তু প্রকৃতির নিষ্পাপ অনুষঙ্গ শকুন্তলাকে কোথাও চঞ্চল বা প্রগল্‌ভা করে তোলেনি প্রণয় প্রকাশে করেনি অসংযতা। তাই দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যখন তার মনে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে তখন প্রকৃতির ফলভারাবনত লার মতই সে বায়ুচঞ্চল সেই আচরণে লজ্জা আছে কিন্তু কামনা উতরোল উল্লাস নেই। আর সবার উপরে প্রকৃতির নিষ্পাপ সারল্যে বর্ধিত হওয়ার জন্য শকুন্তলা নিজেকে ভেবেছে অজাতশত্রু। এই সারল্যবশেই বহিরাগত দুষ্যন্তের প্রণয়কে সে নির্দ্বিচিত্তে স্বীকৃতি দিয়েছে কোন সন্দেহ করেনি। পৃথিবী পতি দুষ্যন্তের রাজমহীষী হওয়ার মোহে নয় প্রগাঢ় প্রণয়বশেই শকুন্তলার এই আত্মদান। এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তপোবনে হরিণী যেন অশঙ্কিত তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক। বস্তুতপক্ষে শকুন্তলা প্রকৃতি দুহিতা না হলে নারীধর্ম লঙ্ঘনের পাপে তাকে ভ্রষ্টা চরিত্রের কলঙ্কে কলঙ্কিতা হতে হও।

শুধু শকুন্তলা চরিত্রের পরিনির্মাণে প্রকৃতির ভূমিকা এনাটকে শেষ হয়ে যায়নি শকুন্তলার সঙ্গে প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নির্ভরতা স্থাপিত হয়েছে তপোবন প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার হৃদয়বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শকুন্তলা মিরান্দা দেস্‌দিমোনা প্রবন্ধে শকুন্তলার সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগসূত্রের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। তপোবন বালিকা শকুন্তলা কেবলমাত্র বল্কল পরিধান করে ক্ষুদ্র কলসীহস্তে বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন করে দিনপাত করেছেন সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নবমল্লিকার মত নিজেও শুভ্র নিষ্কলঙ্ক প্রফুল্ল এবং দিগন্ত সৌগন্ধ বিকীর্ণ কারিণী থেকেছেন। তার ভগিনীর স্নেহ নবমল্লিকার উপর ভ্রাতৃস্নেহ সহকারের

উপর আর পুত্রস্নেহ আশ্রমের মাতৃহীন হরিণশিশুটির উপর শকুন্তলা প্রাক্ বিবাহপর্বে এমনিভাবে প্রকৃতির তরু লতা পুষ্পের সঙ্গে সাংসারিক সম্পর্ক পাতিয়ে নিজের অজান্তে পূর্ণ রমনী হয়ে উঠেছে। তাই শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করে পতিগৃহে যাওয়ার উদ্যোগ করেছে তখন পদে পদে তার পিছুটান মর্মে মর্মে তার বেদনা সেই বেদনার ভাষা যেন এরকম জড়ায়ে রয়েছে পায়ে ছাড়ায়ে যেতে চাই ছাড়ালে ব্যথা বাজে প্রাণে। কেননা কেবল বল্কল বসনে নয় ভাবে ভঙ্গীতে শকুন্তলা যেন তপোবন প্রকৃতিরই এক জীবন্ত সংস্করণ। পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্ কালে তাই সে বলেছে হুলা প্রিয়ংবদে আর্যপুত্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল তবু আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা য়েন উঠিতেছে না। কিন্তু কেবল শকুন্তলাই তপোবনবিরহে কাতর হয়নি তার আসন্ন বিয়োগে তপোবনও ক্রন্দনমুখর। শকুন্তলার অদর্শন আসঙ্কায় সেজন্যই মৃগ তৃণ বিমুখ ময়ূর নৃত্যবিরহিত লতাবৃন্ত থেকে খসে পড়ছে পাতা মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হরিণশিশু শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে মিনতিপূর্ণ ভাষায় যেন বলতে চেয়েছে যেতে নাহি দিব। কিন্তু সমাজের অমোঘবিধানে শেষ পর্যন্ত নিজে কেঁদে ও সকলকে কাঁদিয়ে শকুন্তলা যাত্রা করেছে পতিগৃহাভিমুখে। প্রকৃতির সঙ্গে এখানেই শকুন্তলার বিচ্ছেদ ঘটেছে।

টিপ্পনী

অভিজ্ঞালম্ শকুন্তলম্ নাটকে এর পরেও প্রকৃতির উল্লেখ আছে কিন্তু রিুম্বিতা শকুন্তলার স্বামীকর্তৃক প্রত্যাখ্যানের আকস্মিক বজ্রপাতে সেও তখন ভূলুণ্ঠিতা। শকুন্তলা প্রকৃতির কাছ থেকে যে সারুল্য পেয়েছিল তপোবন পবিত্যাগের পর তপোবন পরিত্যাগের পরও য়ে সারল্য পূর্ণমাত্রায় অটুট ছিল সহসা সেখানে ঘটল চন্দপতন। শকুন্তলা তখন একাকিনী এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়াগেছে। সুতরাং নতুনকরে আর তাকে পুরোনো তপোবনের নিবিড় সান্নিধ্যে স্তাপন করা যায় না। সেজন্যই মারীচের নতুন তপোবনে শকুন্তলা একান্তই নীরব প্রকৃতিও সেখানে কোন কথা বলেনি।

মহামতি শেক্স্পীয়রের টেম্পেস্ট নাটকেও প্রকৃতির একটি সক্রিয় ভূমিকা সতত ক্রিয়াশীল। কালিদাসে যেমন তপোবন শেক্স্পীয়রের নাটকে তেমনি বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ও সমুদ্রতীরর্বতী অরণ্যপ্রকৃতি ।কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই উভয় রচয়িতার প্রকৃতির রুপচিত্রণে পার্থক্যও অনেক।

কালিদাসে তপোবনের প্রশান্তি সেখানে রাষ্ট্রকোলাহল স্বার্থসংঘাত কোন কিছুই নেই। অপরদিকে টেম্পেস্টে রয়েছে নির্জন দ্বীপ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ও ভয়ংকর অরণ্য আর আছে ক্ষমতা লোভী মানুষের ষড়যন্ত্র এবং স্বার্থের টানাপোড়েন। শকুন্তলা লৌকিক সমাজ বিচ্ছিন্ন হলেও লোকসংস্রব বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু টেম্পেস্টে মিরান্দা তার পিতা প্রস্পেরো ও ক্যালিবান ভিন্ন অন্য কোন মানুষের সান্নিধ্যে আসেনি। বিপরীত দিকে তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার সম্পর্ক যেমন নিবিড় ও আন্তরিক মিরান্দারস সঙ্গে সমুদ্র বা প্রকৃতির সম্পর্ক তেমন নিবিড় নয়। স্বার্থলোভ ষড়যন্ত্রের শিখার হয়ে নিরান্দা তার জন্মভূমি তেকে উৎখাত হয়েছিল তাই নির্জন দ্বীপ তারমনে বিরুপতার সঞ্চার করেছে সেই সূত্রেই একাকীত্বের জীবন তাকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার অবকাশ দেয়নি। টেম্পেস্টের বহিঃ প্রকৃতি প্রেতাত্মা এরিয়েলের মধ্যে মানুষ আকার ধারণ করলেও এরিয়েল প্রকৃতপক্ষে মানবিক অনুভূতি বিহীন পরতন্ত্র একটি চরিত্রমাত্র। তার মনে স্নেহ প্রেম প্রীতি আবেগ বেদনা কোন কিছুই দ্বন্ধ ব্যাকুলতা সৃষ্টি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই দুই পৃথক পরিবেশের ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে টেম্পেস্টে পীড়ন শাসন দম শকুন্তলায় প্রীতি শান্তি সদ্ভাব। টেম্পেস্টের প্রকৃতি মানুষ আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই শকুন্তলায় গাছ পালা পশুপাখি আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর

আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়াগেছে।

রবীন্দ্রনাথ এস্থলে শেক্স্পীয়রের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্য একটি পার্থক্যও লক্ষ্য করেছেন। সেই পার্থক্য মূলত গুণগত। শকুন্তলায় প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যে রয়েছে কল্যাণবোধ এবং প্রশান্তি বিশ্বের সঙ্গে তার উদার পরিচয়ের মানবিক ঔদার্য। সেখানে মানুষ কখনই প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু আধিপত্য নিয়ে দ্বন্ধ বিরোধ এবং জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা টেম্পেস্টের মূলভাব। সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে জীবন সংগ্রামের দ্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে প্রতিটি মানুষ। প্রস্পেরোকেও তাই দেখি নির্জন শূন্য দ্বীপে আপনার আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হতে। দ্বিতীয়ত শকুন্তলায় প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে দুরপনেয় যন্ত্রণা মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই ভোগ করেছে সেই যন্ত্রণা টেম্পেস্টে নেই। যে মিরান্দা শৈশব থেকে যৌবনের সোনার প্রহরগুলি নির্জন দ্বীপে অতিবাহিত করল সেই দ্বীপ ত্যাগ করার মুহূর্তে তার মধ্যে কোন বিষন্নতা নেই নেই পিজুটান। সম্ভবত এটাই টেম্পেস্টের সঙ্গে শকুন্তলা নাটকের অন্যতম মৌল পার্থক্য।

টিপ্পনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের নতুন ভাষ্য 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ – মন্তব্যটি কতদূর গ্রহণযোগ্য?

২. 'শকুন্তলার রূপচিত্রণে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা অনন্য মাত্রা অর্জন করেছে' – আলোচনা করুন।

৩. কালিদাসের শকুন্তলা ও শেকস্পীয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের মিরান্দা চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তার পরিচয় দিন।

৪. 'লতার সহিত ফুলের যে রূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ!'– 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি বিচার করুন।

৫. 'প্রাচীন সাহিত্য'–এর অন্তর্ভুক্ত 'শকুন্তলা'কে বস্তুধর্মী প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না – মন্তব্যটি পক্ষে অথবা বিপক্ষে আপনার যুক্তি সজ্জিত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. 'অনেকেই এই কথাটি কবির উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করিয়া লঘুভাবে পাঠ করিয়া থাকেন।' লেখক এখানে যে প্রসঙ্গে একথা বলেছেন তা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করুন।

২. 'তপোবনের হরিণী যেমন অশঙ্কিত তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক।' রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৩. 'টেম্পেস্টে এ ভাবটি নাই।' টেম্পেস্ট কার রচিত? সেখানে কোন্ ভাব নেই? এ সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য কি?

৪. 'টেম্পেস্ট্ নাটকের নামও যেমন তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইরূপ'– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

৫. 'শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।' Paradise Lost এবং Paradise Regained কার রচিত? শকুন্তলা নাটক সম্পর্কে একথা বলার কারণ কি?

মনুষ্য

'মনুষ্য' – উৎসগ্রন্থ 'পঞ্চভূত'-এর পরিচয়

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'কে সঠিক অর্থে প্রবন্ধ গ্রন্থ বলা যাবে কিনা, সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থটির রচনা-আঙ্গিক নিয়ে অনুরূপ বিতর্কই সৃষ্টি হয়। 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'পঞ্চভূত'-এর প্রবন্ধগুলি 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল – আমাদের আলোচ্য 'মনুষ্য' প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ছিল ১৩০০ বঙ্গাব্দ। পরে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'র নাম পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধগুলি একত্রে 'পঞ্চভূত' নামে প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল একত্রিশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে।

পঞ্চভূতের প্রবন্ধগুলি রচনার পূর্বে (উপন্যাস ও ছোটগল্প বাদে) গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী বিচরণ করেননি। ঐ সময় তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যসাহিত্য হল য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, বিবিধ প্রসঙ্গ, আলোচনা, সমালোচনা, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ইত্যাদি। কিন্তু ১২৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত বিপুল গদ্যসাহিত্য এবং সেগুলির বৈচিত্র্য প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উৎকর্ষ প্রমাণিত করে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল – সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, মন্ত্রীঅভিষেক, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য, বিচিত্র প্রবন্ধ ইত্যাদি। ছোটগল্প ও মানসী-সোনার তরী, চিত্রা-রবীন্দ্র কাব্যজীবনের এই স্বর্ণপর্বের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাগত উৎকর্ষ, কাব্যিক ঐশ্বর্য, আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত শৈলী, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, দার্শনিক প্রত্যয় এবং সর্বোপরি জীবন-ঘনিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্য উষ্ণতায় পৌঁছেছিল- এই পর্বের রচনায় তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে – বলা বাহুল্য, পঞ্চভূতের প্রবন্ধগুলি সে-সবের ব্যতিক্রম নয়। তবে এই প্রসঙ্গে যে-কথাটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য তা হল, প্রচলিত প্রবন্ধসাহিত্যের জ্ঞানগর্ভতা, পান্ডিত্যের কচকচি, নিরবচ্ছিন্ন বস্তুধর্মিতা এবং যুক্তি-শৃঙ্খলার অকাট্য অনুসরণ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতে সর্বথা দৃষ্ট হয়না। প্রথমতঃ তাঁর প্রবন্ধের ভাষা পন্ডিতি নয়, যেন কবির ভাষা। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর প্রবন্ধে প্রায় কোন সময়েই একতম বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকেন নি, অনায়াসে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে বিচরণ করেছেন। তৃতীয়তঃ অনেক সময়ে তাঁর একটি প্রবন্ধের বক্তব্য অন্য কোন প্রবন্ধেও পুনরুক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের জগতে একটি ভিন্নমাত্রিক আঙ্গিকেরই সূচনা করেছে অনেক সময়।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি রচনার পিছনে কি কি উৎস রয়েছে, সে-বিষয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নানা সময়ে সেকালের অনেক কৃতবিদ্য গুণিজন, সাহিত্যিক, কবি, চিন্তাবিদ্ প্রায়শঃই আসা-যাওয়া করতেন। সেই উপলক্ষ্যে তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নানারকম মূল্যবান আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করতেন। সেই আলোচনার বিষয়বস্তু 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি'তে

লিখে রাখা হত। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন, "সাহিত্যবিষয়ক কয়েকটি রচনা ও পঞ্চভূতের কয়েকটি প্রবন্ধের খসড়া এখানে খুঁজিলে পাওয়া যায়।"

দ্বিতীয়তঃ, কারও কারও মতে পঞ্চভূতের বৈঠকী আলোচনা বা মেজাজের সঙ্গে গ্রীক মনীষী প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম'-এর সাদৃশ্য আছে। সংলাপনির্ভর ঐ রচনায় যেমন প্রাচীন গ্রীসের মনীষী ও পন্ডিতদের জ্ঞানাগর্ভ আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থেও অনুরূপ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

টিপ্পনী

তৃতীয়তঃ মার্কিন লেখক অলিভার ওন্ডেলহোম্‌স্‌-এর লেখা গ্রন্থ 'দ্য অটোক্র্যাট অব্‌ দ্য ব্রেকফাস্ট টেব্‌ল্‌'-এর রচনারীতির সঙ্গে কেউ কেউ 'পঞ্চভূত'-এর সাদৃশ্যের কথা বলেছেন।

তবে ঐ সমস্ত তুলনা, সাদৃশ্য আবিষ্কার 'পঞ্চভূত'-এর পরিকল্পনা বা বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণতঃ প্রভাবিত করেছে, এরূপ ভাবনা হাস্যকর। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল নতুনের পিয়াসী, নতুন নতুন উদ্ভাবনার কাজে উৎসাহী এবং নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। সুতরাং প্রভাব, সাদৃশ্য যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা নিতান্ত বহিরঙ্গগত।

'পঞ্চভূত' পূর্বে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'চিঠিপত্র' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা নাতি এই দুই কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের বহু বিষয় নিয়ে বিতর্কমূলক আলোচনার অবতারণা করেছিলেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা' ১ম খন্ড-এ মন্তব্য করেছেন, "এই বইখানিতে ও পরবর্তী পঞ্চভূত-এ লেখক একটা ক্ষীণ নাটকীয় পশ্চাৎপট কল্পনা করিয়া যুক্তিতর্কের মধ্যে একটু আবেগের স্পর্শ ও ব্যঙ্গশ্লেষের চমক সঞ্চারের দ্বারা বুদ্ধিগত আলোচনাকে মরস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

'পঞ্চভূত'-এ ডায়ারির ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যও দুর্লভ নয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক প্রকাশের সময় 'ডায়ারি' কথাটি ব্যবহারও করেছিলেন। ডায়ারির প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ আগ্রহও ছিল, যদিও ডায়ারির সারবত্তা বিষয়ে তিনি মোটেই সদর্থক ধারণা পোষা করতেন না। ১৮৯৩ সালে ৩০শে আষাঢ় 'ছিন্নপত্র'-এর একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "এক এক সময় মনে হয়, আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় বা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়। সেগুলি ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভাল; বোধ হয় তাতে ফলও আছে, আনন্দও আছে।" পূর্বেই বলা হয়েছে ডায়ারির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। পঞ্চভূতের 'পরিচয়' প্রবন্ধে ভূতনাথের মুখ দিয়ে সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ডায়ারি লেখার একটি মহদ্দোষ আছে। কারণ ডায়ারি হল একটা কৃত্রিম জীবন, যে জীবন প্রকৃত জীবনের উপর এক প্রকার আধিপত্য বিস্তার করে। জীবনকে খন্ড খন্ড করে ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবন এগিয়ে চলে নানা ঘটনা ও কাজের সমবায়ে - সেখানে পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মে জীবনকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জীবনের মধ্যে রয়েছে অনেক বিরোধ, অসঙ্গতি, 'আত্মখন্ডন' ও অসামঞ্জস্য। কিন্তু ডায়ারির লেখক সেগুলির মধ্যে একটা কৃত্রিম সামঞ্জস্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন - ফলে ডায়ারি পরিণত হয় দ্বিতীয় জীবনে। সে-জীবন কৃত্রিম।

'পঞ্চভূত' গ্রন্থে ক্ষিতি, অপ্‌, মরুৎ, তেজ, ব্যোম এই পঞ্চভূত রবীন্দ্রনাথের হাতে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি, শ্রীমতী স্রোতস্বিনী, শ্রীযুক্ত সমীর, শ্রীমতী দীপ্তি এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমে পরিণত

হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে পঞ্চভূত সভার সদস্যগণ ডায়ারি রচনা করেনি, যিনি করেছেন তিনি ভূতনাথবাবু। অবশ্য ভূতনাথ বাবু বলেছেন ডায়ারিতে "আমার নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের।" তিনি সভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে এও বলেছেন- "তোমরা কিছু ভাবিয়ো না, আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।"

ভূতনাথ বাবু প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-সত্তার প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। সুতরাং এই গ্রন্থের যাবতীয় বক্তব্য নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথেরই। ডায়ারিতে প্রতিদিনের ঘটনা বা কয়েকদিনের ঘটনা তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখসহ বর্ণিত হয়। 'পঞ্চভূত' সেই অর্থে রোজনামচা, দিনলিপি বা দিন পঞ্জিকা নয়। সুতরাং পঞ্চভূতকে Documentary Diary না বলে Intimate Diary বলা যেতে পারে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চভূতকে ফর্মের দিক থেকে "কৌতুকনাট্য, ডায়েরি ও মনন প্রবন্ধের মধ্যবর্তী" একটি নতুন রূপাঙ্গিক বলে অভিহিত করেছেন।

টিপ্পনী

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পঞ্চভূত যেহেতু চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক রচনা, সেইহেতু এখানে একজাতীয় নাট্যরসও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মনুষ্য

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ও 'মনুষ্য' প্রবন্ধ

গ্রীক মনীষী প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম্'-এ যেমন প্রাচীন গ্রীসের গ্রীক পন্ডিত-সমালোচক ও বিশিষ্ট জনের বিচিত্র বৈঠকী আলাপচারিতার বিদগ্ধ পরিচয় আছে, সেই বৈঠকী আলাপের মেজাজেই রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে সাহিত্য, সাহিত্যশৈলী, সাহিত্যতত্ত্ব, মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা, জীবন সম্পর্কে নানান দার্শনিক জিজ্ঞাসা, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয় রবীন্দ্রনাথ সুলভ এক অসাধারণ বাক্‌দক্ষতায় বর্ণিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'মনুষ্য' রচনাটি 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের সেইরকম একটি বিষয় যেখানে সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের বিষয়বস্তু, সাহিত্যের স্টাইল বা শৈলীপকরণ, বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যাখ্যাত প্রেমের অসীমতার তত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় ভূতনাথ বাবু, স্রোতস্বিনী, ক্ষিতি, সমীর, ব্যোম, দীপ্তি প্রমুখ চরিত্রের অন্তরঙ্গ আলোচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

প্রবন্ধটির সূচনায় স্রোতস্বিনী ভূতনাথবাবুর লিখিত ডায়েরির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলেছে, "আমি যে-সকল কথা কস্মিনকালে বলি নাই তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ?" ভূতনাথবাবু এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন তা বস্তুতঃ সাহিত্যের সামগ্রীবিষয়ক বক্তব্যা চরিত্র যা বলে, আর চরিত্র সম্পর্কে স্রষ্টার যা ধারণা, সেই দুটি মিলেই সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টি হয়। কারণ যা ব্যক্ত হয়, আর যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সাহিত্যিক সেই দুইয়ের মিলন ঘটান পূর্ণতার তাগিদে। সাহিত্য 'প্রকৃতির আরশি নহে' - অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তবকে হুবহু অনুকরণ সাহিত্য কখনোই করেনা। প্রতিদিনকার বহমান জীবন, প্রতিদিনকার উচ্চারিত অজস্র কথঅ, বিবিধ আচরণ নব নব ইচ্ছা-অনিচ্ছা এসব বাস্তব জীবনে স্বাভাবিক সত্য রূপে আপনা আপনি প্রকাশিত হয়, - এই প্রকাশ প্রত্যক্ষ। কিন্তু সাহিত্যের প্রকাশ অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং সেই অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ সত্যের মত বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে প্রত্যক্ষও অপ্রত্যক্ষের মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হয়। সাহিত্য প্রতিদিনের বা প্রতিক্ষণের অজস্র উপকরণকে আকারে-ইঙ্গিতে, আভাসে-ব্যঞ্জনায় সংক্ষিপ্ত আকার দেয় - যে সংক্ষিপ্তির মধ্যে চরিত্রের সার-অংশ লুকিয়ে আছে। আসল কথা হল

সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে অবিকল বাস্তবের সংস্কার বলে মনে করেন না – বিশেষ উপায় ও অতিরিক্ত বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে তার মধ্যে সত্যের আভাষ প্রদান করেন।

সাহিত্য উপলব্ধির সামগ্রী। উপলব্ধির আলোকেই সাহিত্যের নব নব সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই সত্য সবসময় তত্ত্বনির্ভর নয়, জীবননির্ভর। ভূতনাথবাবু এরপর যখন বৈষ্ণবপদাবলীতে বিবৃত প্রেমতত্ত্বের নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন, তখন তা বৈষ্ণবপদাবলীর নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে এমন এখ উদারতর ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়, যেখানে প্রেম উপনীত হয় অনন্তের জগতে। ভালোবাসার জনের মধ্যেই অনন্তের অনুভব সত্য হয়ে ওঠে, শুধু তাই নয়, ভূতনাথবাবুর বক্তব্য – "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।" বৈষ্ণবপদাবলীতে দাস্যভাব, বাৎসল্যভাব, সখ্যভাব এবং মধুর ভাবের মধে সেই সীমাতীত ঐশ্বর্য বা অনন্তেরই প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কারণ আমাদের যেটি প্রীতির পাত্র, তার মধ্যেই প্রীতি বা ভালোবাসার ঘনীভূত প্রতীত যেন সীমাতীতের সংবাদ নিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র সে কথা বলেছেন এই ভাবে –

"দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই প্রিয়জনে,
প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি তাই দিই দেবতারে,
আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

পরম প্রেমের মধ্যে এইভাবেই আমরা অনন্তকে অনুভব করি যার ফলে সীমা উপনীত হয় অনন্তে, আর অনন্ত এসে মেশে সীমায়। সীমা-অসীমের এই গূঢ়তত্ত্ব গভীর অর্থদ্যোতক, তাই যত্রতত্র বা যথেচ্ছ এই তত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়টিকে লঘু করে তোলে।

সমীরের বক্তব্য হল বস্তু বা ব্যক্তি নিজে যা, তাকে সেইভাবেই উপস্থাপিত করা বিধেয়। আমসত্ত্ব যেমন আমের বিকল্প নয়, তেমনি চরিত্রের নির্যাসটুকু গোটা চরিত্র নয়। ব্যোমের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। ব্যোমের মতে কোন তর্ক বা তত্ত্ব উপসংহার বা সিদ্ধান্তে সমাপ্তি লাভ করে, এটা চিরসত্য এবং কাম্যও বটে। কিন্তু মানুষের জীবন যেহেতু গতিশীল তার সারসংক্ষেপ বা উপসংহার অসম্ভব। সুতরাং মানবচরিত্রের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়, তা যতই দরিদ্র, গুরুত্বহীন বা পুনরুক্তিমূলক হোক না কেন, সেগুলির দ্বারাই মানবচরিত্রের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্যের তত্ত্ব হিসেবে ব্যোমের এই বক্তব্য মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

পরবর্তী আলোচনায় সমীর ভাষার ভঙ্গীপ্রকরণ বা স্টাইল সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছে। শৈলী বা রীতি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমীরের মতে মানুষের ব্যক্ত করার ক্ষমতা স্বল্প, তাই প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গী এবং ভাবের সঙ্গে ভাবনা যুক্ত করতে হবে আর উপস্থাপিত চরিত্রটির মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে গতিশক্তি। এই গতিশক্তি অনিঃশেষিত, সেজন্য পরিণামও হবে অসমাপ্তিসূচক।

ভূতনাথবাবু সমীরের এই বক্তব্যের সূত্রধরে সাহিত্যে চরিত্রের ঐ পরিণামকে অসমাপ্তিসূচক না বলে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ' এই জাতীয় বক্তব্য পেশ করেছেন, সাহিত্যতত্ত্বের ভাষায় একেই বলে ব্যঞ্জনা।

স্রোতস্বিনী এই আলোচনাসূত্রে একটি বিতর্কের অবতারণা করেছে – তার জিজ্ঞাস্য হল

সাহিত্যে বিষয়টি প্রধান নাকি ভঙ্গীটা মুখ্য। এব্যাপারে ব্যোমের বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিশীল। ব্যোম বলতে চেয়েছে বিষয় ও ভঙ্গীর মধ্যে কোনটির প্রাধান্য তা নির্ভর করে দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর রহস্যময় তার উপর। ব্যোমের মতে, বিষয়টা দেহ, ভঙ্গীটা জীবন। দেহ বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু জীবন একটা চঞ্চল অসমাপ্তি। সাহিত্যের বিচারে এই তুলনাটি প্রয়োগ করলে বলতে হয়, সাহিত্যে বিষয় একটা সীমাবদ্ধ আশ্রয়, কিন্তু সেই স্থূল বিষয়ের মধ্যে ভঙ্গি অনুপ্রবিষ্ট হলে বিষয় নবজীবনপ্রাপ্ত হয়, তার মধ্যে আসে গতির ব্যঞ্জনা, সীমিত বিষয়ার্থ অনির্দেশ্য অর্থব্যঞ্জনায় তখন নিজেকে প্রকাশ করে।

টিপ্পনী

সমীরের বক্তব্য এরপর প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা। সাহিত্য হল সহিতত্বস্থাপনের মাধ্যম। মানবজীবন, আরও ব্যাপকঅর্থে মানব-জগতের সঙ্গে সহিতত্ব স্থাপনই তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং সাহিত্যের বিষয়বস্তু সেই চিরপুরাতন মানবকে নিয়েই। কিন্তু স্রোতস্বিনী এই ভাবনার সঙ্গে তার নিজস্ব ভাবনা যুক্ত করে বলেছে সাহিত্যে আমরা এমন এমন মানুষ লক্ষ্য করি যে মানুষদের পুরাতন মনুষ্যত্বেরই একটা নতুন বিস্তার বলে মনে হয়। দীপ্তির মতে মানুষের মনের এবং চরিত্রের যে প্রকাশিত রূপ বা আকৃতি, তারই নাম স্টাইল। দীপ্তির এই মতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাবনা মিলে যায়, কারণ পাশ্চাত্যে বলা হয় 'Style is the man' রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ভঙ্গী বলতে সাহিত্যের প্রকরণশৈলীকে নির্দেশ করেননি, ভঙ্গী বলতে সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্ব বা স্টাইলকেও বুঝিয়েছেন।

সাহিত্য-শিল্প ও সাধারণজীবন ঃ রবীন্দ্র-অভিমত

সাহিত্য কেবলমাত্র ব্যক্তিনায়ক, জননায়ক বা অভিজাত নায়কের বিচরণক্ষেত্র নয়। অন্ততঃ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'মনুষ্য' রচনায় সমীর এই মত ব্যক্ত করতে চেয়েছে। মানবজগতে উন্নতশীর্ষ করিতকর্মা লোকের পৃথখ আসন আছে সত্যি, কিন্তু তার বাইরেও বৃহত্তর সাধারণ মানুষের একটা পৃথক জগৎ আছে। সেই জগতের মানুষেরা মহানায়ক নয় সত্যি, কিন্তু তথাকথিত মহানায়কদের আত্মীয়স্বজন বটে। সেই মানুষদের আবিষ্কার করা, এবং সাহিত্যে তাদের যথোচিত প্রতিষ্ঠা করার একটা মহৎ দায়িত্ব সাহিত্যিকদের আছে। লোকসমাজের অখ্যাত চরিত্র সাহিত্যিকের সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে মহিময় রূপে আবিষ্কৃত হতে পারে। জহরকে চেনার জন্য যেমন প্রকৃত জহরী চাই, তেমনি অজস্র মানুষের ভীড় থেকে প্রকৃত মানুষকে চিনে বার করা জহরী-সাহিত্যিকের কাজ - সমীরের আক্ষেপ সেই জহরীর সংখ্যা একান্তই নগণ্য।

ভূতনাথের আলোচনায় বিষয়টি উঠে এসেছে এইভাবে। ভূতনাথ মনে করেন মানুষ হিসেবে মানুষকে না চেনাটা সধৈর্ব সত্য নয় - "মানুষ পরস্পরকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এথ ভালোবাসা কী করিয়া?" ভূতনাথবাবু এর সমর্থনে তাঁর চোখে দেখা জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ থেকে বহুদূর অবস্থিত এক যুবকমুহুরির জীবনকথা উপস্থাপিত করেছেন। সামান্য অর্থ উপার্জনের

জন্য পিতৃ- মাতৃহারা পিসীমার কাছে লালিত-পলিত ঐ যুবক প্রত্যহের কঠোর শ্রমের পর হয়তো দূরান্তে অবস্থি তা পিসীমার জন্য একটা অপার শূন্যতা অনুভব করত। পিসীমার প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই ঐ শূন্যতাবোধের কারণ। ভূতনাথবাবুর এই উপলব্ধির পিছনে যে নিগূঢ় কারণ তা অবশ্যই মানবিক। যে যুবক-মুহুরির প্রতি এযাবৎ ভূতনাথবাবু প্রায় উদাসীন ছিলেন, সেই যুবকটি একদিন সন্ধ্যায় যখন ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের প্রাণসংশয় নিশ্চিত

টিপ্পনী

জেনে 'পিসিমা' 'পিসিমা' করে আর্তস্বরে কেঁদেছিল, সেদিন নিঃসন্তান বিধবা পিসিমার তার প্রতি মাতৃস্নেহ যে কত অকৃত্রিম ও সুগভীর ছিল, এবং পিসিমাও যে যুবকটির হৃদয়ের শ্রদ্ধামন্ডিত কোন্ নিভৃত আসনে সমাসীন ছিলেন, ভূতনাথবাবু তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। যুবকটির প্রাণরক্ষা ভূতনাথবাবু করতে পারেননি, কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল অখ্যাতযুবকের হৃদয় থেকে অনুপ্রাণিত ভালোবাসার এক করুণ পাঁচালী ভূতনাথবাবুর মনে এই বিশ্বাস এনে দিয়েছিল যে, "ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ, তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। ... মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে, আর আমাদের মতো দীপ্তিহীন ছোটো ছোটো লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়; পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায় - মানুষে পরিপূর্ণ।" সমীরও বলেছিল, "পৃথিবীতে যাহাদিগকে অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখিব তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিস্তৃত আত্মবিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভীষ্মদ্রোণ মহাকাব্যের নায়ক, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে, ... ।"

স্রোতস্বিনীর জবানীতেও আমরা জানতে পারি হতদরিদ্র হিন্দুস্থানি বেহারা নিহরের কথা - নিহর দরিদ্র, সম্বলহীন, দুটি শিশুসন্তানের পিতা, সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগে মুহ্যমান - কিন্তু তার জীবিকা সম্পাদনে সে কৃতসংকল্প। সামান্য উপার্জনের জন্য পাখাটানার কাজে তার বিরতি নেই। একদিকে মৃত স্ত্রীর প্রতি ভালোবাস ও শোক, অন্যদিকে শিশুসন্তান দুটিকে বাঁচিয়ে রাখার গভীর অপত্যস্নেহ এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট নিহরকে দেখে স্রোতস্বিনী বিশ্বমানবের বেদনাকে অনুভব করে। নিহর তখন শুধু ব্যক্তিমানুষ নয়, জগতের সমস্ত হতভাগ্যমানুষের প্রতিনিধি। এই হতভাগ্য মানুষেরা চিরদিন উপেক্ষিত; তাদের জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ সুখী ও সম্পন্ন মানুষদের চোখে মূল্যহীন; সাহিত্যেও তারা অস্পৃশ্য। অথচ দয়ায়, মায়ায়, সেবায়, আত্মত্যাগে তারা পরিপূর্ণ মানুষ। কিন্তু তাদের এটাই করুণ ভবিতব্য যে, তারা নিজেদের জানান দিতে জানে না। স্রোতস্বিনী মনে করে কর্তব্য। ক্ষিতির বক্তব্যে এরপর এযুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অল্পবিস্তর পরিবর্তনের কথা জানা যায়। সাহিত্যে এতদিন প্রবলতার যে আধিপত্য ছিল তা ক্রমশঃ খর্ব হচ্ছে, "এখন অকৃতী অক্ষমেরাও সংসারের খুব একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার কাব্য-উপন্যাসও ভীষ্মদ্রোণকে ছাড়িয়া এই সমস্ত মূক-জাতির ভাষা, এই সমস্ত ভাষাচ্ছন্ন অঙ্গারের আলোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"

সমীরের বক্তব্যেও ক্ষিতির অভিমতের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে। আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয় হল সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক যেহেতু অচ্ছেদ্য তাই সমাজ যখন প্রবনের অধীনসু ছিল তখন সাহিত্যও সেই প্রবলেরই আধিপত্য ছিল, কিন্তু সামাজিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সঙ্গে মানুষের অভিযোজন প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন আকার ধারণ করেছে, সেইহেতু সাহিত্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বৃহত্তর মানবসমাজ।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধের বক্তব্যবিষয় অভিনব - 'মনুষ্য' প্রবন্ধেও সেই অভিনবত্ব আছে - আলোচনা কর।

২. মনুষ্য রচনাটির শ্রেণী নির্দেশ করুন।

৩. মনুষ্যরচনার উল্লিখিত চরিত্রগুলির পরিচয় দিন।

৪. 'মনুষ্য' প্রবন্ধে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন।

৫. তাহাদের উপরে কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা, আমাদের এখনকার কবিদের কর্তব্য। উদ্ধৃতিটি অবলম্বনে বক্তার মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা নির্ণয় করুন।

টিপ্পনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন (প্রসঙ্গসহ)

১. 'কিন্তু এ যেন তুমি একখানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছ।'

২. 'জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।'

৩. 'তর্ক বলো, তত্ত্ব বলো, সিদ্ধান্ত এবং উপসংহারেই তাহাদের চরমগতি, সমাপ্তিতেই তাহাদের প্রধান গৌরব।'

৪. 'সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতিপুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।'

৫. 'পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির।'

৬. 'যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায় – মানুষে পরিপূর্ণ।'

টিপ্পনী

টিপ্পনী

টিপ্পনী